মেয়েদের অধিকার

গুণদা মজুমদার

বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ
১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক :
বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ
১/৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩৫-৩১৫৯

মুদ্রণ :
শ্রী সুধাতোষ বসু
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও ছবি :
শ্রী অমিতাভ দত্ত

মুখবন্ধ

এই আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে ভারতীয় সমাজে নারীর অধিকার সম্বন্ধে সহজ প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় এই প্রকার সঙ্কলনের প্রয়োজন ছিল। শ্রী গুণদা মজুমদার প্রায় একটি দুঃসাধ্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ভারতীয় সমাজে নারীর অধিকারের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস ও বিষয়টীর বৈচিত্র্য, বিরাটত্ব ও জটিলতা একটি স্বল্পপরিসর আলোচনার মধ্যে সীমিত রাখা দুরূহ; কিন্তু এই কঠিন কাজটি তিনি সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করিয়াছেন এবং নারী সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান স্বাধিকার ও সমাধিকারের ইতিহাস তিনি যে ভাবে সরলীকৃত করিয়াছেন তা প্রশংসনীয়।

ভারতবর্ষ একটি বিচিত্র দেশ। বিভিন্ন ভাষা, জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম, আচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতবর্ষকে একটা মহাজাতির উপ-মহাদেশ বলা চলে। এই বিরাট দেশের বৈচিত্র্যকে একই সুসংবদ্ধ আইনের বন্ধনে গ্রন্থিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার যে প্রয়াস চলিতেছে তাহাকে বৈপ্লবিক বলা চলে। এই সুনিয়ন্ত্রনের প্রয়াসের মধ্যে প্রতি জাতির বা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা ও সংস্কারকে যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টাও করা হইতেছে। সুতরাং নারীর অধিকারগত প্রশ্নেও স্বীকৃত প্রথা ও আইনের নীতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। বৃহৎ সম্প্রদায়গুলি বাদ দিলেও ভারতবর্ষে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রথা আইনে স্বীকৃত হইয়াছে। উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে সামাজিক প্রথা ও আইনের স্বাতন্ত্র্য আজও বর্ত্তমান। এই উপমহাদেশে এখনও মাতৃভিত্তিক ও পিতৃভিত্তিক সমাজ বিদ্যমান যাহাদের সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ সংক্রান্ত প্রথা বা আইন এখনও স্বীকৃত।

এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থে এই বিচিত্র দেশের নারীর অধিকারের পূর্ণ বা বিশদ আলোচনা সম্ভব নহে, এবং গ্রন্থকার সে চেষ্টা সঙ্গত কারণেই করেননি। কিন্তু নারীর অধিকারের মৌল সূত্রগুলি এবং তৎসংক্রান্ত আইনের একটা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সহজবোধ্য ভাষায় রচনা করিয়াছেন যাহাতে এই দেশের বৃহত্তর নারীসমাজ স্বল্প শিক্ষিত হইয়াও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারেন। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান বা পরিচয় না থাকিলে অধিকার প্রয়োগ বা দাবী করা যায় না। এই অভিজ্ঞানের প্রয়োজনেই এই পুস্তিকার প্রকাশ সময়োচিত হইয়াছে।

শ্রী অজিত কুমার দত্ত

ভূমিকা

'মেয়েদের অধিকার' আইনের বই নয়। আইনের পণ্ডিত বা শ্রদ্ধেয় এডভোকেট ব্যারিষ্টার প্রভৃতি যাঁরা আইনজ্ঞ ও আইনে যশ লাভ করেছেন তাঁদের জন্য এ বই নয়। 'মেয়েদের অধিকার' আমাদের দেশের মেয়েদের জন্য লেখা হয়েছে। বিশেষ করে সেই সব মেয়েদের জন্য লেখা হল, যাঁরা জানেন না তাদের কত অধিকার আছে আর, সে সব অধিকারগুলিই বা কি, কিই বা তাদের পরিচয়।

অধিকার বলতে বোঝায় আইনে কি অধিকার আছে। কোন অধিকারকে শুধু সমাজ মেনে নিলে সে অধিকারে শক্তি পাওয়া যায় না। আইনই অধিকারকে শক্তিশালী করে, এবং সে অধিকার সকলে মেনে চলেন। সেজন্য এই বই লিখতে আইনের কেতাবগুলির সাহায্য নিতে হ'য়েছে। অধিকারগুলি বোঝাবার জন্য আইনের নাম ও জায়গায় জায়গায় সেই আইনের ধারাগুলি দরকার মত তুলে দেওয়া হয়েছে।

'মেয়েদের অধিকার' বই এর জন্য আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও ভূতপূর্ব এডভোকেট জেনারেল শ্রী অজিত কুমার দত্ত একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। এই বই লিখতে অন্য দুই বন্ধু আমায় বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁরা হলেন, এডভোকেট শ্রী তারাপদ ঘোষ এবং এডভোকেট সৈয়দ আবুল মনস্থর হবিবুল্লাহ। এই বিশিষ্ট আইন-জীবিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গুণদা মজুমদার

সূচীপত্র

মেয়েদের অধিকার

মেয়েদের অধিকার মানে মেয়েদের আইনগত অধিকার। মেয়েদের অধিকার রক্ষার জন্য এদেশে কি কি আইন ছিল বা আছে সেই বিষয় আমরা এই বইতে বলব। প্রায় সব দেশেই পুরুষ হচ্ছে প্রধান। পুরুষই প্রথম সারিতে থাকে, আর মেয়েরা থাকে পিছনের সারিতে। সভ্য সমাজে সব দেশেই আমরা মেয়েদের হয়ত সম্মান দেখাই। কিন্তু তাঁদের উঁচু আসনে বসতে দিই না। প্রায় সব দেশে সমাজ ও দেশ চালায় পুরুষেরা ; মেয়েরা কোথাও কোথাও ঢুকতে শুরু করেছেন বটে, তবে সংখ্যায় এখনও তাঁরা নগণ্য। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা ; কিন্তু যে পার্লামেণ্টের তিনি নেতা সেই পার্লামেণ্টে মোট মহিলার সংখ্যা হবে শতকরা দশজনেরও কম। তাঁর মন্ত্রীসভায় পুরো মন্ত্রী অন্য কোন মহিলা নেই, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সামান্য কয়েকজন।

আইন বদল ঃ এই পুরুষ প্রধান সমাজে আইন পুরুষেরাই গড়েছেন। আর সেই আইন স্বভাবতই পুরুষদের সুবিধার জন্য হয়েছে। অবশ্য, কোন দেশের আইন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনা। আইনের রদবদল হয়, আইন পালটায়। হয় আইনের এক ধারা বদল করে আর এক নতুন ধারা যোগ করা হয়। না হয়ত আইনের খোল নলচে সব পালটিয়ে নতুন আইন করা হয়। আইন কিন্তু খুব সহজে পাল্টান হয় না। অনেক ঠেকে শিখে, অনেক তর্ক বিতর্ক করে, পক্ষে ও বিপক্ষে নানা

বাদানুবাদ হবার পর আইন পাল্টাবার মত ঠিক হয়। শুধু মত ঠিক হলে হয় না; কি ভাবে বদল হবে, কোথায় কোথায় বদল হবে এই সব বিচার করতে হয়। এই বিচার করতে বেশ সময় লাগে। প্রথমে বিলের খসড়া তৈরী হয়; সেই বিল আইন সভায় (পার্লামেণ্টে বা বিধান সভায়—যেখানে যেটা বিচার হবে) পেশ করার পর প্রয়োজনমত জনসাধারণের মতামত নেবার জন্য পাঠান হয়। না হলে আইন সভায় সভ্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে সেই কমিটিতে আলোচনার জন্য বিলটি যায়। আলোচনা বেশ কিছুদিন চলতে থাকে। কখনও কখনও এক বছর দু বছর পার হয়ে যায়। তারপর আসে আইন সভায়। আইন সভায় নানা তর্ক বিতর্কের পর হবু আইনের প্রতিটি ধারা বিচার করা হয়। দরকার পড়লে সংশোধন করে বিলটি পাশ হয়। রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাবার পর বিলটি আইনে পরিণত হয়, ও দেশে সেই আইন চালু হয়। প্রচলিত আইন বদলাবার আগে একটু সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে বিচার বিবেচনা করে নিতে হয়। এটা একদিক দিয়ে ভাল। কারণ, যে আইন সকলকে মানতে হবে, সে আইন তৈরী করতে তাড়াহুড়া না করাই উচিত।

মেয়েদের অধিকার হরণ: আইন বদলাবার আরও একটা কারণ ঘটে। বহু যুগ ধরে এমন আইন চলে আসে যার ফলে দেশের অর্ধেক লোক তাদের ন্যায্য অধিকার হারায়। এমন ঘটনা ঘটেছিল ব্রিটেনে। ইংরেজরা বড়াই করেন যে তাঁদের দেশে প্রথম পার্লামেণ্ট গঠন হয়। দুনিয়াময় আর কোথাও তার আগে এভাবে দেশজুড়ে পার্লামেণ্ট হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেই পার্লামেণ্টে সভ্য পাঠানর জন্য দেশের সাবালকদের

মধ্যে অর্ধেক সাবালক ভোট দিতে পারতেন না। তখন ইংরেজদের দেশে শুধু পুরুষেরা ভোট দিতে পারতেন। মেয়েদের কোন ভোট ছিল না। সেই দেশ দুবার যখন শক্তিশালী হয় তখন দেশে রাজত্ব চালনা করেছেন দুজন বিখ্যাত মহিলা। একজনের নাম রাণী প্রথম এলিজাবেথ। তাঁর সময় জগৎ-জোড়া খ্যাতির কবি সেক্‌সপীয়র ইংলণ্ডে কাব্য ও নাটক লিখছেন। আর একজন হলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। তাঁর সময়ে ইংরেজ বড় সাম্রাজ্য গড়েছিল, অনেক দেশ ইংলণ্ডের অধীনে গিয়েছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া অনেক সম্মান পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজত্বে কোন সাধারণ ইংরেজ মেয়ের একটি ভোটও ছিল না। সাবালিকা কোন মেয়ে পার্লামেণ্টের মেম্বারও হতে পারতেন না। এই অবস্থা চলে প্রায় আড়াই শ' বছর। এখন থেকে প্রায় ৫৬ বছর আগে প্রথম মহাযুদ্ধ থামবার পর ১৯১৯ সালে একজন সাহসী তেজী ইংরেজ মহিলা মেয়েদের ভোট দেবার অধিকারের দাবীতে আন্দোলন করতে নামেন। তাঁর নাম প্যাঙ্কহারস্‌ট। এ আন্দোলন বেশ কিছুদিন চলে এবং অনেক ইংরেজ মহিলাকে ইংরেজ সরকার জেলে পাঠান। শেষ পর্যন্ত তাঁরা জয়ী হন এবং ভোট দেবার অধিকার পান। আমাদের দেশে অবশ্য স্বাধীনতার আগেই মেয়েরা পুরুষদের মত ভোট দেবার অধিকার পান। তবে সেটা ইংলণ্ডের মেয়েরা পাবার পর আমাদের দেশে চালু হয়।

প্রাচীন প্রথা: এখন মেয়েদের আইন নিয়ে আলোচনা করার আগে দেখা যাক আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সমাজে মেয়েদের কি স্থান ছিল। উপনিষদে বলে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা একাকী সঙ্গীহীন ছিলেন। একা থাকতে ব্রহ্মা আনন্দ

পাচ্ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা করলেন তাঁর সঙ্গী হোক। তিনি বললেন, আমি বহু হব। তিনি নিজ শরীর ধারণ করে শরীরকে এতবড় আকার দিলেন যাতে তার মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী অবস্থান করতে পারে। তারপর তিনি সেই দেহকে দু-ভাগ করলেন। সেই একই দেহ হতে পতি ও পত্নী জন্ম লাভ করলেন। আর সেই পতি ও পত্নী হতেই এই জগৎ সংসার সৃষ্টি হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। এখানে পুরুষ ও নারীকে সমান সম্মান দেওয়া হয়েছে। কারণ দুজনে ব্রহ্মার একই দেহ হতে সৃষ্ট। আবার, নারী ছাড়া পুরুষ পূর্ণ হয় না। দুজনেরই দরকার। একজন ছাড়া অন্যজন পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ সাধন ও পূর্ণ জীবন পান না।

মৈত্রেয়ীর কথা ঃ উপনিষদের আর এক মধুর কাহিনী হল, যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথা। যাজ্ঞবল্ক্য মহা-ঋষি। রাজসভায় দেশে বিদেশে তাঁকে সবাই মস্ত বড় জ্ঞানী বলে মান্য করেন। তিনি বিদ্যা দান করতেন, ছাত্রদের পড়াতেন। সংসারের সব কর্তব্য কর্ম শেষ করে ঋষি ঠিক করলেন, তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবেন, বনবাসী হবেন। ঋষির দুই পত্নী—কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। যাজ্ঞবল্ক্য নামী ও মানী পুরুষ। ছাত্রদের পড়াবার জন্য রাজারা তাঁকে অনেক জমি দিয়েছেন। সেই জমিতে চাষ হয়, তার বহু ফসল গোলায় গোলায় ভরা আছে। গো-শালায় অনেক দুগ্ধবতী গাভী, তারা প্রচুর দুধ দেয়। ছাত্রদের থাকার জন্য কত কুটীর। তাছাড়া তিনি কত জিনিষ, নানারকম কত উপহার নানা জায়গা হতে পেয়েছেন। সংসার ত্যাগ করার সময় এর সমস্তই তিনি দান

করে যাবেন, সঙ্গে কিছুই নিয়ে যাবেন না। সে সব সম্পত্তি পাবার অধিকারী হলেন তাঁর দুই সহধর্মিনী—কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। তাঁদের দুজনকে দুই সমান ভাগ করে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি প্রথমে কাত্যায়নীর কাছে গিয়ে বললেন—ভদ্রে, আমি সন্ন্যাস নিয়ে বনবাসী হব, তোমার অনুমতি নিতে এসেছি। আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দুই সমান ভাগ করেছি। এক ভাগ তুমি লও, অন্য ভাগ মৈত্রেয়ী পাবে। কাত্যায়নী স্বামীকে প্রণাম করে বললেন—আর্যে, আপনি আমাদের এতদিন পালন করেছেন, আপনার স্নেহ প্রেম ও ঔদার্যে আমরা ধন্য। এখন আপনাকে সেবা করার সৌভাগ্য আর পাব না। আপনি জ্ঞানী ও সাধক; আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করছেন, এতে আমি সানন্দে বিনয়ের সঙ্গে আমার সম্মতি জানাচ্ছি।

যাজ্ঞবল্ক্য তারপর তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী মৈত্রেয়ীর কাছে গেলেন। মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য একই কথা বললেন। সংসার ছাড়ার আগে তাঁর অনুমতি চাইলেন। তিনি যে সম্পত্তি মৈত্রেয়ীর জন্য রেখেছেন তাও মৈত্রেয়ীকে জানালেন। মৈত্রেয়ী জানতেন তাঁর স্বামী কেন সংসার ছেড়ে বনবাসী হতে চলেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য এতদিন অমৃতের তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। অমৃত কি বস্তু তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছেন। অমৃত পাবার অধিকারী হতে হলে কি করতে হয়, কি ছাড়তে হয় সে সব বিষয় তিনি বুঝিয়েছেন। কিন্তু অমৃতের স্বাদ কি তা অমৃতময় না হলে ত' বোঝা যায় না! অমৃতময় হতে হলে শুধুই অমৃতে মগ্ন হতে হয়; অন্য সব কর্ম, সব ধ্যান, সব ধারণা ত্যাগ করতে হয়, তাই যাজ্ঞবল্ক্য বনে যাচ্ছেন। মৈত্রেয়ী স্বামীর জ্ঞান পিপাসা ও

অমৃতপান ইচ্ছার কথা জানতেন। তিনি তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভগবন, আপনি আমাকে যে এত ধনদৌলত দিচ্ছেন, সেই সব নিয়ে পড়ে থাকলে কি আমি অমৃত পাব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না প্রিয়ে! এ সব ভোগ করলে কেবল ভোগ পিপাসা বাড়বে, তাতে অমৃতের অধিকারী হওয়া যাবে না। তখন মৈত্রেয়ী বললেন, প্রভু, আমি যা দিয়ে অমৃত পাবনা তা নিয়ে আমি কি করব? আমি যাতে অমৃত গ্রহণ করতে পারি আপনি তার ব্যবস্থা করুন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য খুশী হয়ে তাঁর প্রিয় পত্নীকে অমৃতে অধিকারী হওয়ার জন্য উপদেশ ও জ্ঞান দিতে লাগলেন।

এখানে আমরা কয়েকটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি। প্রথম—পতি-পত্নীর যৌথ সংসারে একজন আর একজনকে শ্রদ্ধা করছেন। স্বামী সংসার ত্যাগ করার আগে পত্নীর অনুমতি চাইছেন। পত্নী স্বামীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনার অংশ নিতে আগ্রহী; স্বামীও সানন্দে পত্নীকে সেই পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করানর জন্য সাহায্য করছেন। এই আদর্শ সুন্দর মধুময় সমাজ এখন নেই। দ্বন্দ্ব, অ-প্রেম ও অবিশ্বাস দিয়ে আজ সব দেশের সমাজদেহ জীর্ণ হয়েছে। কেন এমন হল? সে কথা আলোচনার আগে পুরাতন কথার একটা ভুল ভাঙ্গা যাক।

নারী নির্যাতন: আমাদের দেশে নারীদের ওপর বহু কঠিন নির্দয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। উত্তর ভারতে ও পূর্বভারতে এই সব বিধিনিষেধের চাপ ছিল বেশী। বাঙলা-দেশে বহু নির্দয় ও অমানুষিক বিধি সেদিন পর্যন্ত চালু ছিল। একাদশীর দিন এখানে বিধবা মা, ঠাকুমা, পিসি, মাসী, জেঠাইমা ৩০।৩৫ বছর আগেও নির্জলা উপবাস করতেন। তার আগে

বাল্য-বিবাহ হত। ছোট বয়সে নয় বছর পার হবার আগে মেয়ের বিয়ে দিলে নাকি গৌরীদান হত। নয় বছরের মেয়ে পনের বছর পড়ার আগে বিধবা হলেন, এমন নজীর বহু আছে। ভেবে দেখুন, পনের বছরের সেই কচি মেয়ে সারাদিন উপবাসে কাটাচ্ছে। শুধু খাওয়া বন্ধ নয়, পিপাসায় জল স্পর্শও করতে পারবে না। চিন্তা করুন, বাড়ন্ত মেয়ে, দেহে তার যৌবনের জোয়ার এসেছে ; মন-প্রাণ-দেহ প্রকৃতি হতে ভরপুর রস টেনে নিতে চাইছে। আবার প্রকৃতিকে দান করার জন্য তার মন-প্রাণ-দেহ উন্মুখ হয়ে আছে। ঈশ্বরের সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যলীলা থেকে সেই অভাগীকে শুধু বঞ্চণা করা হল তা নয় ; তার জীবনকে শুকিয়ে মারার জন্য এই গ্রীষ্মের দেশে খরতাপে তাকে তৃষ্ণার জল দেওয়া বন্ধ হল। ধর্মের নামে এর চেয়ে অমানুষিক অত্যাচার আর কি হতে পারে ? তাই দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শাস্ত্রমতে বিধবা-বিবাহ আইন-সিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তখনও ভারতের নারী সমাজ বহু অধিকার ভোগ করতে পারতেন না ; পুরুষদের দয়ার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বাঁচতে হত। তাই বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হলেও কার্যত বেশি এগোয় নি। আমাদের দেশে সতী-দাহের মত নিষ্ঠুর বিধির কথা এখানে না হয় বাদ দিলাম। কারণ, রাজা রামমোহন রায় সে প্রথা রদ করিয়েছিলেন ; এখন সতীদাহ প্রথা লুপ্ত।

এই সব প্রথা যারা চালু করেছিলেন তাঁরা শাস্ত্রকার ও পুরাণের দোহাই দেন। আর বলেন, এই শাস্ত্র ভগবানের শ্রীমুখ হতে নির্গত হয়েছে। শ্রীমুখের বাণী কে শুনেছেন জানি না, কিন্তু সামান্য একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কোন লৌকিক শাস্ত্রই অভ্রান্ত নয়। আর কোন বিধি বিধান অমর নয়।

সমাজের জন্য বিধি বিধান তৈরী হয়। কালের গতির সঙ্গে সমাজ বদলায়, বিধি বিধানও বদলায়। পুরাণ ও সংহিতা অনেকবার বদল হয়েছে। সুতরাং আদ্দিকালের বদ্দিবুড়ী এখনও ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে দেড় মণ চাল তুলবে, এটা সম্ভব নয়। আদ্দিকালের সময় পেরিয়েছে, বদ্দি বুড়ী মানে তার বিধি বিধানের কালও পার হয়েছে। তবুও পুরান কথা ঘাঁটতে গিয়ে একটা কথা এখানে বলে রাখা ভাল। মনু নারীদের সম্বন্ধে বলেছেন, "নারীকেও পালন করতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে।" আবার বলেছেন "যেখানে নারী পূজিত হন অর্থাৎ যেখানে নারীকে সম্মান দেখান হয়, সেখানেই দেবতারা বিরাজ করেন।" সম্পত্তি দাবীদারদের মধ্যে নারীকেও মনু স্থান দিয়েছেন। সে বিষয় যথা সময়ে আমরা বলব। মনু-সংহিতা পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আমাদের মেনে চলতে হবে এমন মাথার দিব্য কেউ দিতে পারেনা। নতুন হিন্দু আইনে যেসব বদল হয়েছে, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে, তাতে মনুর দাপট বিশেষ নেই। তবু মনুর কথা বলা হল তার কারণ তাঁর সময়ে সমাজে নারীকে কিভাবে দেখা হত বোঝানোর জন্য।

বিদুষী গার্গী ঃ আরও আগে যাজ্ঞবল্ক্যের কথা হচ্ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য এক রাজসভায় প্রবেশ করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য রাজা স্বীকার করে নেবেন—এই তাঁর ইচ্ছা। তাহলে তাঁর ছাত্র পালনে সহায়তা হয়। সব জ্ঞানের সেরা জ্ঞান হল ব্রহ্ম বিদ্যা। এই বিদ্যা যে কেউ সহজে আয়ত্ত করতে পারে না। চরিত্রবান, ধীর, জ্ঞানী ব্যক্তি—যাঁর রাগ নেই, হিংসা নেই, লোভ নেই, যাঁর কাছে সুখ ও দুঃখ দুইই সমান, যিনি সর্বজীবে অকাতরে প্রেম বিলিয়ে দেন, যিনি সর্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বর দর্শন করেন—তিনিই ব্রহ্ম

বিদ্যার অধিকারী। সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যখন রাজসভায় প্রবেশ করলেন, তখন বিদুষী জ্ঞান-তপস্বিনী গার্গী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ব্রহ্ম বিদ্যা জানেন? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, হ্যাঁ। গার্গী তাঁকে বহু প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা করে গার্গী সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হ্যাঁ, এ ঋষি ব্রহ্ম বিদ্যা পারদর্শী। তাহলে দেখুন গার্গীর মত এক মহিলা যাজ্ঞবল্ক্যের মত এক মহা পণ্ডিতকে তর্কে আহ্বান করলেন। সভার সকলের সমর্থনেই এই তর্ক যুদ্ধ এক মহিলা চালিয়ে গেলেন; এবং তিনি রায় দিলে যাজ্ঞবল্ক্য সম্মান পেলেন। তখনকার সমাজে নারীর উচ্চ স্থান না থাকলে এটা সম্ভব হত না। সেটা বহু যুগ আগের কথা। তারপর প্রায় কয় হাজার বছর ধরে ভারতের নারী যে অবিচার পেয়ে এসেছেন তার কারণ কি?

প্রধান কারণ, পুরুষ-প্রধান সমাজ। এটা শুধু আমাদের দেশে নয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পুরুষ-প্রধান সমাজে নারীকে সমান স্থান দেওয়া হয়নি। তাকে ছোট করা হয়েছে। আমাদের দেশে উত্তরভারতে ঢুকে বহু বিদেশী আক্রমণ করতে এসেছে, লুটপাট করেছে। অনেক দস্যুদল ঘর জ্বালিয়েছে, নারী অপহরণ করেছে, ধন দৌলত কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে। মন্দির ধ্বংস করেছে। আমরা নিজেদের শক্তিকে একজোট না করে শতধা বিচ্ছিন্ন করেছি। নিজের নিজের পবিত্রতা বাঁচাতে গিয়ে আর সবাইকে দূরে ঠেলে দিয়েছি। যেখানে সকলকে এক করতে হবে, সকলকে আলাদা রেখেছি, দূরে সরিয়েছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার মত তেত্রিশ কোটি জাত তৈরী করেছি।

সেজন্য বিদেশীরা বরাবর যখন আক্রমণ করেছে, লুটপাট করেছে, নারীহরণ করে পালিয়েছে, তখন তাদের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি হারিয়ে আমরা সমাজটাকে একটা খোলসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি। আর নারী যখন পুত্র-প্রদায়িনী তখন তার ওপরই বেশী বিধিনিষেধের চাপ দিয়েছি। সেই জন্যই সতীদাহ, বিধবার উপর নির্যাতন, গৃহলক্ষ্মীকে অন্ধ কুঠরিতে নির্বাসন।

নতুন আলো ঃ মেয়েদের জন্য ভারতবর্ষে গত ২০।২৫ বছর ধরে যে সব আইন হয়েছে, সেই সব আইনে মেয়েদের উপর অনেক অত্যাচার বন্ধ হয়েছে, মেয়েদের অনেক নতুন অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই সব নতুন আইনের মূল বিষয়গুলি আমরা আলোচনা করব। সমাজে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার ভোগ করাতে হলে কোন কোন ক্ষেত্র আগে বেছে নিতে হ'বে দেখা যাক। প্রথম হচ্ছে শিক্ষা, দ্বিতীয় হচ্ছে কর্ম ও জীবিকা ; তারপর পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার। পরে বিবাহে সম্মানের সহিত সমান অধিকার, দত্তক-গ্রহণ ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয় বর্ণনা করার সময় আমরা দেখব স্বাধীনতার আগে কি ছিল এবং তারপর কি হয়েছে।

শিক্ষা ঃ প্রথমে শিক্ষা ধরা যাক। শিক্ষার অভাব ঘটলে কেউ বড় হতে পারে না, সমাজ শক্তিশালী হয় না। অথচ আমাদের নারীদের শিক্ষার আলোক হতে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। দেড়শ বছরের ওপর আমাদের দেশে স্কুল কলেজ চলছে। পুরুষেরা প্রথমে সে সুযোগ নেন। কিন্তু তাঁরা মেয়েদের পড়াশোনায় কোন উৎসাহ দেখান না। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বেথুন সাহেব অনেক চেষ্টা করে আমাদের দেশের মেয়েদের স্কুলে পড়াতে

নিয়ে আসেন। তখনও মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হত, সেজন্য স্কুলে তারা বেশিদিন থাকত না। আর শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে কোন বউ ঘোমটা মাথায় দিয়ে স্কুলে আসতে পারত না। সুতরাং স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে একটা পাশ করে যাঁরা বেরিয়েছেন তাঁরা কলকাতার বড় ঘরের মেয়ে। বেশির ভাগ তাঁরা ভারতীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম সমাজের। কলেজ ডিঙান অনেক পরের কথা। বাঙলা দেশের প্রথম গ্রাজুয়েটদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার প্রায় ৪০ বছর পর কবি কামিনী রায় প্রথম মহিলা যিনি বি-এ পাশ করেছেন। পরে অনেকে এম-এ, পি-এইচ-ডি পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ পরীক্ষায় মেয়েরা ফার্স্ট হয়েছেন, ছেলেরা পরে। বিজ্ঞানে, শিল্পে, ডাক্তারীতে, ওকালতীতে এমনকি ইনজিনিয়ারিং-এ মেয়েরা পড়ছেন, পাশ করছেন। এখন দেখা যায় শিক্ষায় মেয়েদের উৎসাহ বা উদ্দীপনা ছেলেদের চেয়ে কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের বেশি।

অনেক বছরে দেখা যায় মেয়েরা পরীক্ষায় ছেলেদের চেয়ে বেশি ভাল করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুল মাষ্টারী বা কলেজে পড়ানয় মেয়েরাও অনেকে আছেন; শিক্ষার সবচেয়ে উঁচু তলায় উপাচার্যের পদে (ভাইস-চ্যানসেলার) এসেছেন মহিলা। গত বছর যে বিজ্ঞান কংগ্রেস হল তার সভাপতি ছিলেন একজন বিদুষী বাঙালী মহিলা। অনেক মহিলা ডাক্তার ইংলণ্ড আমেরিকা ঘুরে এসে বড় ডাক্তার হয়েছেন। আইনের কলেজে এখন মেয়েদের খুব ভীড়। মেয়েরা অনেকে উকীল বা এড্‌ভোকেট হয়ে হাইকোর্ট থেকে শুরু করে জেলা আদালতে ওকালতী করছেন। আবার ইনজিনিয়ারিং পাশ করে অনেক

মেয়ে বাড়ীর নক্সা তৈরী করে দিচ্ছেন। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের এখন আর কোন বাধা নেই। বুড়ো কর্তারা এখন কেউ আর মেয়েদের বলেন না, "লেখাপড়া শিখে কি করবি? জজ ম্যাজিষ্টার হবি?" সে যুগ পেরিয়ে গেছে। এখন মেয়ে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সত্যিই হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, মেয়েরা এখন লেখাপড়া শিখে অনেক পড়ন্ত সংসারকে বাঁচিয়েছে, তাকে রক্ষা করেছে, ভাইবোনদের লেখাপড়া শিখিয়েছে, তাদের মানুষ করে তুলেছে। আগে বিধবা মাকে অপরের দয়ার ওপর বাঁচতে হত। এখন ছেলেমেয়ে সবাই লেখাপড়া শেখায় ছেলের সঙ্গে মেয়েও সংসারের টাল সামলে দিচ্ছে।

কাজ কর্ম ঃ তারপর কর্ম বা জীবিকার কথা। আগে ভারতীয় মেয়েদের সব জায়গায় কাজ দেওয়া হত না। কিন্তু আমাদের সংবিধানে পুরুষ ও নারীর অনেক অধিকার দেওয়া হয়েছে। পুরুষের মত নারীর সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পুরুষের মত নারীর সমান যোগ্যতা থাকলে নারীও সেই একই কর্ম করতে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি এখন কর্মে যোগ দিতে নারীর কোন বাধা নেই। সরকারে সবচেয়ে বড় চাকুরী হল আই-এ-এস। এঁরাই জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হন, সরকারী দপ্তরে সবচেয়ে উঁচু পদে বসেন, সেক্রেটারী হন। অনেক মেয়ে আই-এ-এস হয়েছেন এবং সরকারী দপ্তরে উঁচু পদে ঢুকেছেন। তাঁদের প্রায় সকলকেই ম্যাজিষ্ট্রেট হতে হয়। আর মহিলা মন্ত্রী হওয়া ত' পুরোন হয়ে গিয়েছে। ত্রিশ বছর আগে জবাহরলাল নেহরুর ভগিনী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রথম মহিলা মন্ত্রী হয়েছিলেন, তারপর বাঙলা দেশের মেয়ে স্বর্গতা সুচেতা কৃপালনী উত্তরপ্রদেশের মত সবচেয়ে বড় প্রদেশে

প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাল্যকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন।

সুতরাং শিক্ষা দীক্ষায় কাজে কর্মে ভারতীয় নারীদের কোন আইনগত বাধা নেই। আমাদের সংবিধানে পরিষ্কার করে বলা আছে পুরুষ বা নারীর মধ্যে কোন অধিকারের কোন ভেদ থাকবেনা, দুজনেই সমান অধিকার পাবেন। যেমন ভোট দেবার অধিকার। আমরা আগেই বলেছি ইংলণ্ডে প্রায় আড়াইশ' বছর ধরে পার্লামেণ্টের নির্বাচনে মেয়েরা ভোট দিতে পারতেন না। তাঁরা লড়াই করে সে অধিকার আজ প্রায় ৫৫ বছর আগে আদায় করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে ভোট দেওয়ার প্রথা চালু হতেই মেয়েদের ভোট দেবার অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে। আর আমাদের দেশে পুরুস বা মেয়ে ২১ বছর বয়স হলেই ভোট দেবার অধিকার পাবেন। আর ২৫ বছর হলে পুরুষ বা মেয়ে যে কেউ নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন। এই অধিকার সংবিধানে মানা হয়েছে। এদিক দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও অনেক দেশের মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে আছেন।

পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিঃ এখন আমরা আলোচনা করব পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার। পর পর হিন্দু, অহিন্দু ও মুসলমান সমাজের নারীদের অধিকার আলোচনা করব। এটা মস্ত বড় বিষয়। প্রথমে আমরা দেখব মেয়েরা যুগ যুগ ধরে কিভাবে বঞ্চিত হয়েছেন, কত অসহায় নারী সমাজের অবিবেচনায় কত নির্যাতন ভোগ করেছেন এবং তারপর ২০ বছর আগে কিভাবে স্বাধীন ভারতের নতুন সরকার তাঁদের সত্ব ও অধিকার আইন করে দিয়ে দিয়েছেন।

পুরুষদের সম্পত্তিতে হিন্দু নারীদের বিশেষ অধিকার ছিল না। শাস্ত্রকার বৌধায়ন মনে করতেন, নারীদের কোন বিচার বুদ্ধি নেই, তারা কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবার অযোগ্য। আরও অনেক শাস্ত্রকার মনে করতেন, নারী স্বভাবে দুর্বল, কোমল মন ও অস্থির চিত্ত; তার হাতে সম্পত্তি দিলে তা নিরাপদ থাকবেনা। পুরুষ-প্রধান সমাজ সেজন্য নারীকে সম্পত্তির অধিকার হতে বেশ দূরে সরিয়ে রেখেছিল। মাত্র কয়েকটি জায়গায় সেই অধিকার দেওয়া হয় ছোট গণ্ডির মধ্যে।

মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ ঃ হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার বিষয় ঠিক হয় দুইভাবে—(১) মিতাক্ষরা এবং (২) দায়ভাগ। সারা ভারতবর্ষে চলে মিতাক্ষরা মতে আর শুধু বাঙলাদেশে (পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায়) চলে দায়ভাগ। দুটোর রীতি নীতিতে বেশ প্রভেদ আছে। মিতাক্ষরা মতে পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মালেই যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে তার অধিকার বলবৎ হয়। কিন্তু দায়ভাগে পিতা জীবিত থাকাকালীন সম্পত্তিতে পুত্রের কোন অধিকার জন্মায় না। তার মানে কাশীতে বা পাটনায় বা পুণায় বা মাদ্রাজে পরিবারে ছেলে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির অংশীদার হয়, তারও মালিকানা জন্মায়। কিন্তু বাঙলাদেশে পিতা বর্তমানে সম্পত্তিতে ছেলের কোন মালিকানা বা কোন সত্ব জন্মায় না। পুত্র পিতার ওয়ারীশ হতে পারে, কিন্তু দায়ভাগে পিতা পুত্রকে পারিবারিক সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে পারেন ; মিতাক্ষরে তা সম্ভব নয়। মিতাক্ষরা মতে পিতা যৌথ সম্পত্তি ইচ্ছামত বিলি করতে পারেন না। পুত্রকে তার অংশ হতে বঞ্চিত করতে পারেন না। শুধু মাত্র যে সম্পত্তি তিনি নিজে

জীবিতকালে গড়ে তুলেছেন তার ওপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মিতাক্ষরার এই যৌথ সম্পত্তিতে পুরুষেরা সহজে নারীর প্রবেশ পছন্দ করেনি। সেজন্য বৌধায়ন নারীদের অবজ্ঞা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে বৌধায়নকে উত্তর ভারতের লেখকরা মান্য করতেন, পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বৌধায়নকে সব বিষয় মানতেন না। তার একটা বড় কারণ পশ্চিম ভারতে —গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে এবং দক্ষিণ ভারতে—তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহীশূর কেরেলা প্রভৃতি স্থানে নারীদের সম্মান ছিল বেশি। পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারতে উত্তর ভারতের মত পর্দাপ্রথা চালু হয়নি। ধর্মের ব্যাপারে অবশ্য দক্ষিণ ভারত গোঁড়ামি দেখিয়েছে, মন্দিরে বহু ব্যক্তিকে আগে ঢুকতে দেয়নি। সেটা অন্য ব্যাপার, নারী-পুরুষের সম্বন্ধের ব্যাপার নয়।

সম্পত্তিতে মেয়েদের স্থান : দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার বিষয় বলা হল। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঠিক করতে তাদের মধ্যে মতে যতই অমিল থাক, মেয়েদের বেলায় তাদের মতে পুরোপুরি মিল। মিতাক্ষরার বৌধায়নের সঙ্গে দায়ভাগের শাস্ত্রকার জীমূতবাহনের এখানে গলায় গলায় ভাব। দুদলের মতেই মেয়েদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন সম্পত্তির ওয়ারীশ হতে পারেন। কর্তা মারা গেলে এই পাঁচজন ওয়ারীশ হতে পারবেন। পুরাতন নিয়ম অনুসারে তাঁরা হলেন—বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতামহী (ঠাকুরমা) ও প্রপিতামহী (বাবার ঠাকুরমা)। তাঁরা একসঙ্গে সবাই অংশ পেতেন না। একজন জীবিত না থাকলে পরের জন। তাও যে পরপর পাচ্ছেন, তাও নয়। আর কর্তা মারা গেলে তাঁর সহধর্মিনী স্ত্রী, যিনি সব চেয়ে নিকট, সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারীশ হতে

পারতেন না। তার আগে ছেলে, নাতি (ছেলের ছেলে) ও পুতি (ছেলের নাতি) সম্পত্তি ভোগ করত। এরা কেউ না থাকলে তবে বিধবা স্ত্রী পেতেন। সুতরাং কর্তা মারা যাবার পর তাঁর বিধবাকে ছেলে বা নাতির অধীনে থাকতে হত। বাঙলাদেশে দায়ভাগ প্রথা চালু ছিল। সেই নিয়মে কর্তার সম্পত্তির যাঁরা যাঁরা ওয়ারীশ হতে পারতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৫৩। আর সেই ৫৩ জনের মধ্যে মাত্র এই পাঁচজন (বিধবা স্ত্রী, মেয়ে, মা, দুই ঠাকুরমারা) মহিলা আর বাকী ৪৮ জন ওয়ারীশ হতেন সব পুরুষ। বাবা, ভাই, জেঠা, খুড়ো, মামা আর ঠাকুরদা, দাদামহাশয় থেকে আরম্ভ করে অন্য দুই পুরুষ বা তিন পুরুষ ওপরে বা নীচে অন্য সব ওয়ারীশ হতো পুরুষ। ওয়ারীশ ছোট শিশু হলেও সে হবে ছেলে, মেয়ে হলে চলত না। আর কার কোথায় জায়গা থাকত দেখুন—

বিধবা স্ত্রী—তিন জনের পর। কন্যা তার মার পর।

কর্তার গর্ভধারিনী মা—সাতজন পর, কিন্তু তাঁর কর্তার পর।

ঠাকুরমা—তের জন পর কিন্তু তাঁর কর্তার পর।

বাবার ঠাকুরমা—উনিশ জনের পর, কিন্তু তাঁর কর্তার পর।

মেয়ে ছাড়া বাকী চারজন যখন সম্পত্তি পাবার কোন সুযোগ পেতেন তখন তাঁরা বৃদ্ধা হয়েছেন আর স্বামীহারা হয়েছেন। এইসব বিধবারা একবেলা খেতেন, রাতে হয় উপবাস না হয় চিঁড়ে মুড়ি। মাসের মধ্যে চারটে উপবাস লেগেই থাকত— দুটো একাদশী, একটা অমাবস্যা আর একটি পূর্ণিমা। সুতরাং সম্পত্তি পেয়ে তাঁরা আর কি ভোগ করবেন? ভোগ করারও বিধি নিষেধ ছিল। মেয়ে ওয়ারীশদের মধ্যে কেউই সম্পত্তি দান

খয়রাত উইল করা বা বিক্রী করতে পারতেন না। সম্পত্তির যেটুকু আয়, সেটুকুই যতদিন বেঁচে থাকতেন ততদিন ভোগ করতে পারতেন। তবে সম্পত্তির দায় দেনা মিটিয়ে তিনি ভোগ করতেন। তিনি দেহ রাখলে তারপরে যে পুরুষ ওয়ারীশ তালিকা মত আসবেন তাঁর হাতে সম্পত্তি চলে যাবে। সেই পুরুষ ওয়ারীশ সেই সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হবেন। তিনি ইচ্ছা করলে ঐ সম্পত্তি নিয়ে যা খুসী তাই করতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে সম্পত্তি বেচে দিতে পারতেন বা অন্য কাউকে উইল করে দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু মেয়ে ওয়ারীশের সে অধিকার ছিল না। মেয়ে ওয়ারীশ সম্পত্তির আয়টুকু নিয়ে অনেক ভোগ ভোগান্তির পর যখন পরলোকে গিয়ে শান্তি পেতেন তখন তাঁর পাওয়া সম্পত্তিটা গোটা গিয়ে উঠতো পরের যে পুরুষ ওয়ারীশ আছেন, তাঁর ঘরে। তার মানে পুরুষ ওয়ারীশ সম্পত্তি নিয়ে যা খুসী তাই করতে পারতেন, কিন্তু মেয়ে ওয়ারীশ যক্ষী বুড়ির মত সেই সম্পত্তিটিকে আগলিয়ে থাকতেন, আর তিনি গত হলে, তাঁর যত্নে রাখা সম্পত্তিটা, তার পুরোটাই, পরের যে ওয়ারীশ সেই পুরুষ মহাজন পেতেন।

কন্যার অধিকার ঃ কর্তার বিধবা স্ত্রীর পর তাঁর মেয়ে ওয়ারীশ হতে পারতেন, কিন্তু সেখানেও বাছাই ছিল। প্রথম বাছাই হ'ল অবিবাহিত কন্যা (আইবুড়ো মেয়ে) ; তার পরে যে মেয়ের ছেলে আছে, বা ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মেয়ে যদি নিঃসন্তান বিধবা হয় তাহলে তাকে বাদ দিয়ে, যে মেয়ের নিজের ছেলে আছে বা তার মেয়ের ছেলে আছে তা হলে সেই মেয়েই পাবে। সধবা মেয়ে বাঁজা হলে বা বিধবা মেয়ে পুত্রহীনা হলে বাদ পড়তেন। আবার শ্বশুর বেঁচে থাকতে যদি

জামাই নিজের ছেলে না থাকলে, দত্তক পুত্র নেবার কথা শ্বশুরকে জানান, এবং পরে শ্বশুর মারা যাওয়ার পরে দত্তক পুত্র নেন, তাহলে জামাইয়ের স্ত্রী অর্থাৎ কর্তার মেয়ে ঐ সম্পত্তির ভোগ-সত্ত্ব পেতেন। তার মানে সম্পত্তির রাজা ছিলো পুরুষ ওয়ারীশ, আর মেয়ে ওয়ারীশরা সেই সম্পত্তির শুধু পূজারিণী ; মেয়েরা সম্পত্তির সামান্য প্রসাদটুকু পেতেন।

এখানে আবার বলে রাখা দরকার যে সব মেয়ে ওয়ারীশদেরই একই রকম অধিকার ছিল, সে অধিকারের কথা আগে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সম্পত্তির ওপর পুরো অধিকার কোন মেয়ে ওয়ারীশের ছিল না। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মেয়েদের আর এক দফা হেনস্থা করা হত। সম্পত্তি পাওয়ার আগে মেয়ে ওয়ারীশ যেন সতীসাধ্বী থাকেন, ওয়ারীশের এই সর্ত ছিল। অসতী প্রমাণ হলে সেই মেয়ে ওয়ারীশ বাদ পড়তেন। অবশ্য সম্পত্তিতে অধিকার জন্মাবার পর সেই সব কথা আর ওঠান যেত না। দায়ভাগের মতে যে পাঁচজন মেয়ে ওয়ারীশকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই সতীত্বের জবাবদিহি করতে হতো। কিন্তু মিতাক্ষরদের বেলায় সতীত্বের কথাটা শুধু কর্তার বিধবা স্ত্রীর বেলায়ই ওঠান যেতে পারতো, অন্য কোন মেয়ে ওয়ারীশদের বেলায় নয়।

আরো তিনজন মেয়ে ওয়ারীশ : অনেক বছর পরে ১৯২৯ সালে আরো তিনজন মেয়ে ওয়ারীশ যোগ করা হয়। তাঁরা হলেন—ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, এবং ভগিনী। এই মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ দুইজনের জন্যই চালু করা হল।

মেয়েদের আইনে প্রথম বড় পরিবর্তন : মেয়েদের অধিকারে প্রথম বড় উন্নতি দেখা দিল ১৯৩৭ সালে অর্থাৎ

স্বাধীনতা পাবার দশ বছর আগে। ১৯৩৭ সালের ১৮ নং আইনে জানান হ'ল যে কর্তার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী তাঁর ছেলের সঙ্গে সমান অংশীদার হবেন। কর্তার যদি একাধিক পত্নী থাকে, তাহলে সব পত্নী মিলে একটা অংশ ছেলের সঙ্গে পাবে। এরপর কর্তার বিধবা পত্নীর আরও বেশি নতুন সুবিধা দেওয়া হল ১৯ বছর পরে। সে কথা আমরা পরে বলব, নতুন আইন আলোচনার সময়।

দায়ভাগের দলের বিধবা পত্নী এই নতুন আইনের বলে স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির অংশ ছেলের সঙ্গে সমান ভাগে পাবার অধিকারী হলেন। কিন্তু মিতাক্ষরা দলের বিধবা পত্নী, স্বামীর সম্পত্তির সেই অংশটুকুর অধিকাব পাবেন, যেটা তাঁর স্বামী নিজে তৈরী করেছেন।

বিধবা পুত্রবধূঃ এই নতুন আইনে, কর্তার মৃত্যুর সময় যদি তাঁর কোন বিধবা পুত্রবধূ বর্তমান থাকেন তাহলে সেই বিধবা পুত্রবধূও স্বামীর অবর্তমানে স্বামীর মত সম্পত্তির একটা অংশের অধিকারী হবেন। অর্থাৎ বিধবা পুত্রবধূর স্বামী বেঁচে থাকলে, তিনি যেমন পুত্র হিসাবে একটা অংশ পেতেন সেই রকম তিনি জীবিত না থাকাতে তাঁর পাওনা অংশ তাঁর বিধবা পত্নী পাবেন, কিন্তু বিধবা পুত্রবধূর যদি পুত্র সন্তান থাকে, তাহলেও তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে অংশ পাবেন। এই রকম একই ভাবে কর্তার বিধবা নাত্‌বৌ সম্পত্তির অংশ পাবেন।

এই আইনে বিধবাদের সম্পত্তি পাবার দুটি সর্ত আছেঃ

১। সম্পত্তিতে কোন বিধবাই আগে সম্পূর্ণ অধিকার পেতেন না। ১৯৩৭ সালের এই নতুন আইনে সেই সর্ত বহাল রইল ; তার মানে আগের মতই বিধবারা সম্পত্তির তাঁর অংশের

আয় ভোগ করতে পারবেন, কিন্তু দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করতে পারবেন না। আর তাঁর মৃত্যুর পর আইন অনুযায়ী যে ওয়ারীশ তাঁর পরে আসবেন, সেই ওয়ারীশের অধিকারে যাবে।

২। স্বামী যদি দেনা করে থাকেন, তাহলে সেই দেনা বিধবা তাঁর আয় থেকে পরিশোধ করবেন। অবশ্য এই দেনা আইনের চোখে পরিশোধ-যোগ্য হওয়া চাই।

এই আইনে বিধবার নতুন অধিকার ঃ

১। ১৯৩৭ সনের এই আইনে, বিধবাকে সম্পত্তির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু তাঁকে অনেক দুর্ভোগ হতে বাঁচান হয়েছে। আগেকার আইনে, কর্তা গত হলে, তাঁর সম্পত্তি প্রথমে যেত পুত্রের হাতে, পুত্র না থাকলে পৌত্রের হাতে, তা না হলে প্রপৌত্রের (ছেলের নাতির) হাতে। এরা কেউ না থাকলে কর্তার বিধবা পেতেন।

এই আইনে ঠিক হলো, কর্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিধবা ধর্মপত্নী তাঁর ছেলের মত সম্পত্তির একটা অংশ পাবেন। আগের ব্যবস্থায় অধিকাংশ বিধবাকে অপরের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হতো। আইনে যদিও কর্তার সম্পত্তি থেকে তাঁর বিধবার খোরপোষ দেবার ব্যবস্থা ছিল, তাহলেও বিধবার দুর্দ্দশা ঘুচত না। কারণ, খোরপোষের ব্যয় আর কতটুকু! যে মহিলা একদিন বাড়ীর গিন্নী ছিলেন, যিনি কত লোককে লালন পালন করেছেন, কত দান-খয়রাত করেছেন, তিনি কর্তা চলে গেলে যদি নিঃস্ব হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁকে অনেক মনোবেদনা পেতে হয়। উপরন্তু, বিধবার নিজের কোন সম্বল না থাকলে শ্বাশুড়ী-বউয়ের সম্বন্ধ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তিক্ত হয়ে

ওঠে। পরিবারের ও ছেলেমেয়ের কল্যাণের জন্য এই তিক্ততা বহু আগেই বন্ধ করা উচিৎ ছিল। ১৯৩৭ সালের আইন সেই তিক্ততা দূর করেছে।

২। এই আইনের বলে বিধবাকে সম্পত্তি পেতে হলে, আগেকার মত সতীত্বের প্রশ্ন নিয়ে বিব্রত হতে হত না। অর্থাৎ এই প্রশ্নটা এই আইনে বাদ দেওয়া হলো।

৩। যে বিধবা সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন তিনি ইচ্ছা করলে পুরুষ ওয়ারীশের মত তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে নেবার ক্ষমতা তাঁকে এই আইনে দেওয়া হ'ল। অর্থাৎ বিধবা তাঁর নিজের অধিকারের সীমানা আইনের সাহায্যে ঠিক করে নেবার শক্তি পেলেন। আগেকার আইনে এ ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যদিও ১৯৩৭ সালের আইনে মেয়েরা সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার পেলেন না ; পরে তা পেয়েছেন। পরের কথা পরে বলব।

৪। বিধবার সম্পত্তি হতে যে আয় হয় সেই টাকা সবটাই সেই বিধবা মহিলা ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন। শুধু তাই নয়, বিধবা মহিলা যদি দেখেন, তাঁর স্বামীর সম্পত্তির আয় হতে তাঁর পূজা-পার্বণের খরচা কুলোচ্ছেনা, তাহলে তিনি টাকা কর্জ করতে পারেন। আবার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তিনি টাকা কর্জ করতে পারেন। তিনি স্বামীর আত্মার কল্যাণের জন্য যদি মন্দির করতে চান বা পুষ্করিণী খুঁড়ে দিতে চান, তাহলে তার জন্য সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে তিনি টাকা তুলতে পারেন। এছাড়া তাঁর স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য যদি তিনি কোন সৎকাজ করতে চান, তাহলে তিনি জমির একটা ন্যায্য অংশ সেই কাজে দান করতে পারেন। এই সব উদ্দেশ্য ছাড়া সম্পত্তির অধিকারী বিধবা অন্য কোন হবু অংশীদারের সম্মতি নিয়েও

সম্পত্তির কোন অংশ লিখিতভাবে দান খয়রাত করতে পারবেন না।

১৯৩৭ সালের—"বিষয় সম্পত্তিতে হিন্দু মহিলার অধিকার আইন"—পাশ হবার পর বহু নিঃস্ব বিধবা মহিলা বেঁচে গিয়েছেন। শুধু বিধবা পত্নী বা বিধবা মাতা নন, বিধবা পুত্রবধূ এবং বিধবা পৌত্রবধূ (নাত বৌ) এই আইনের ফলে অনেক সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু এই আইনে বিধবাদের পূর্ণ সত্ব দেওয়া হয়নি। কন্যা স্থানীয়া কোন মেয়েকেও আগে পূর্ণ সত্ব দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পর নূতন আইন করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদের তালিকা সম্পূর্ণ বদল করা হয় এবং মেয়েদের যোগ্য স্থান দেওয়া হয়; এবং মেয়ে হোক ছেলে হোক যিনি সম্পত্তির ওয়ারীশ হবেন বা সম্পত্তিতে তার অংশ দখলে পাবেন, তিনি পূর্ণ সত্ব নিয়ে তা ভোগ করতে পারবেন।

মেয়েদের সমান অধিকারঃ ১৯৩৭ সালে মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার আইন বলবৎ হবার পর, অনেক বছর কেটে গিয়েছিল। ঊনিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে মেয়েদের অধিকারের পুরো মর্য্যাদা দেওয়া হলো। ১৯৩৭ সালের পর বহু ঘটনা ঘটে গেছে। দু'বছর পর বিশ্বজোড়া লড়াই শুরু হয়েছে, আর সেই ভয়ঙ্কর লড়াই ছয় বছর চলেছে। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে ইংরেজ সরকার আমাদের দেশের নেতাদের সঙ্গে কথা বার্তা শুরু করলেন, আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ তার পতাকা নামিয়ে নিল, আর আমাদের জাতীয় পতাকা লাল কেল্লায় উড়লো। ইংরেজ যাবার সঙ্গে কিন্তু আমাদের জন্য কিছু বিপদও রেখে গেল। দেশ ভাগ হলো, আর দেশের দুদিকে

ভাই ভাইয়ের রক্তে দেশের মাটি লাল হয়ে উঠল। এর মধ্যেও আমাদের দেশের জন্য আইন গড়া নিয়ে বৈঠক বসেছে, আলাপ আলোচনা চলেছে। কিন্তু তখন সেই সময় শুধু মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দেবার সুযোগ ছিল না। স্বাধীন ভারতের নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। তার দু'এক বছরের মধ্যেই মেয়েদের নিয়ে নানান আইন তৈরী হতে লাগলো। হিন্দু মেয়েরা যাঁরা এতদিন বঞ্চিত ছিলেন তাঁরা শুধু সম্পত্তির ব্যাপারে নতুন অধিকার পেলেন, তা নয়; মেয়েরা বিবাহ ও বিবাহিত জীবন নিয়ে অনেক নতুন অধিকার পেলেন। এই আইনগুলি ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে পাশ হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৫২ সাল নতুন পার্লামেণ্ট হবার পরেই প্রধান মন্ত্রী নেহেরু আরো সব নেতাদের সাহায্য নিয়ে এসব বিষয়ে হাত লাগালেন।
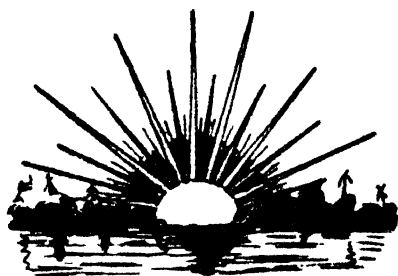
হিন্দু উত্তরাধিকার আইন

(১৯৫৬ সালের ৩০ নং আইন)

প্রথমে ধরা যাক মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকারের কথা। সম্পত্তি নিয়ে নতুন যে আইন হ'ল তার নাম হল "হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬।" সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ে দুজনেরই অধিকার আছে। সুতরাং উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যখন আইনটা আমূল পাল্টে গেল তখন শুধু মেয়ে নয়, ছেলেদেরও সুবিধা হল। প্রথমে দেখা যাক এই আইনের আওতায় কারা কারা পড়েন। অর্থাৎ 'হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬" কাদের জন্য তৈরী হল।

এই আইনের ২য় ধারায় বলা হচ্ছে কারা কারা এই আইনের আওতায় পড়বেন ঃ

(ক) যে কোন প্রতিষ্ঠা বা যে কোন রূপে যিনি হিন্দু ধর্মে আছেন ; তাঁরা বীর শৈব হতে পারেন, লিঙ্গায়েত হতে পারেন অথবা ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ বা আর্য সমাজভুক্ত হতে পারেন।

(খ) যে কোন ব্যক্তি বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মের মধ্যে নিজেকে রেখেছেন।

(গ) অন্য যে কোন ব্যক্তি যিনি ইসলাম ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম, পারসী ধর্ম বা ইহুদী ধর্ম পালন করেন না। অবশ্য যদি প্রমাণ হয় যে কোন ব্যক্তি হিন্দু আইন বা আচারের মধ্যে পড়েন না এবং এই আইন পাশ না হলে নিজেদের জন্য হিন্দু আইনের আশ্রয় নিতেন না, তাঁরা বাদ পড়বেন।

(ব্যক্তি অর্থে পুরুষ ও নারী উভয়কেই বোঝায়)

(আরও পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য নীচে যাঁদের কথা বলা হচ্ছে তাঁরা ধর্মে হয় হিন্দু, অথবা বৌদ্ধ, বা জৈন বা শিখ)

(ক) যে কোন শিশু—বৈধ হোক বা অবৈধ হোক—যার পিতামাতা ধর্মে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ।

(খ) যে কোন শিশু—বৈধ হোক বা অবৈধ হোক—যার পিতা বা মাতা ধর্মে হয় হিন্দু বা বৌদ্ধ, বা জৈন বা শিখ এবং যে শিশু সেই পিতা বা মাতার সমাজে, গোষ্ঠীতে, দলে বা পরিবারে লালিত পালিত হয়েছে।

(গ) যে কোনও ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, বা শিখ ধর্ম গ্রহণ করেছেন বা পুনরায় ফিরে এসেছেন।

তৃতীয় ধারায় বলা হচ্ছে যদি কেউ হিন্দু ধর্ম পালন নাও করেন তাহলেও এই আইনে যাঁদের কথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে তাঁরা সকলেই এই আইনের আওতায় আসবেন।

দুই নম্বর ধারায় ভাল করে বলা হয়েছে—এই আইন কাদের জন্য তৈরী হয়েছে, এবং তাঁদের সকলকেই এই হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের মধ্যে গণ্য করা হবে। আরও একটা কথা বিশেষভাবে বুঝতে হবে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অবৈধ সন্তানকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না।

অবৈধ সন্তানের সঙ্গে তার মার অটুট সম্বন্ধ; সুতরাং উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অতএব মাতার সম্পত্তিতে বৈধ বা অবৈধ সব সন্তানের অধিকার থাকবে।

পুরাতন আইন বাতিল ঃ হিন্দু উত্তরাধিকার নিয়ে যে নতুন আইন ১৯৫৬ সালে চালু হল সেই আইনের বলে আগে এই উত্তরাধিকার সম্পর্কে যত আইন ছিল বা সেই আইনের ব্যাখ্যা ছিল তা সব বাতিল হয়ে গেল। নতুন আইন ছেলে

সাজান হয়েছে। এখানে সম্পত্তিতে মেয়েদের পুরো অধিকার দেওয়া হয়েছে। শুধু বিধবা পত্নী নয়, মেয়ে, নাতনী (ছেলের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে) ছেলের নাতনী বা মেয়ের নাতনী সবাই যতটুকু সম্পত্তি পাবে তার ওপর পূর্ণ অধিকার থাকবে। আগেকার কোনও আইনে মেয়েদের এতবড় অধিকার দেওয়া হয়নি!

নতুন আইনে দু জায়গায় একটু আলাদা ব্যবস্থা হয়েছে। মিতাক্ষরা দলে যাঁরা আছেন তাঁদের বেলায় সামান্য একটু পৃথক ব্যবস্থা হয়েছে। মিতাক্ষরা আইনে ছেলে জন্মালেই যৌথ সম্পত্তির একটা অংশের পুরো মালিক হয়, কিন্তু মেয়ে জন্মালে অংশ পায় না। কিন্তু নতুন আইনের ফলে মিতাক্ষরা দলের মেয়েরাও সম্পত্তির অন্য ভাগে পুরো অধিকার পাবেন। মিতাক্ষরায় যেটা যৌথ সম্পত্তি সেটায় মেয়েদের অধিকার না থাকলেও যৌথ সম্পত্তিতে স্বামীর বা পিতার যে অংশ সেই অংশ বিধবা পত্নী, বিধবা পুত্রবধূ, বিধবা নাতবৌ এবং কর্তার মা ও মেয়েরাও ওয়ারীশ হবেন। আরও কয়েকজন মহিলা ওয়ারীশ আছেন তাঁদের কথা পরে বলা হচ্ছে। মিতাক্ষরা দলের কর্তা যে সম্পত্তি নিজে করেছেন তার ওপর এঁদের দাবী ছেলেদের সঙ্গে সমান থাকবেই; তাছাড়া ৬নং ধারা অনুযায়ী যৌথ সম্পত্তিতে কর্তার যে অংশ আছে তাতে এই সব মেয়েদের অধিকার থাকবে, তার মানে কর্তা বেঁচে থাকলে যৌথ সম্পত্তি ভাগ করে যে অংশ পেতেন, সেই অংশে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও সমান অংশ পাবেন। আর কর্তার নিজে গড়া সম্পত্তি হলে ত' কথাই নেই; সেই সম্পত্তির সবটার ওপর এই সব মেয়েদের অংশ থাকবে।

আর এক জায়গায় একটু আলাদা ব্যবস্থা হয়েছে। মাদ্রাজ বা ত্রিবাঙ্কুর—কোচিন (বর্তমান কেরালা) প্রদেশে যেখানে বংশধারা মায়েদের দিক থেকে ধরা হয়। সেই সব প্রদেশে এই নতুন আইন একটু আলাদা ভাবে বলবৎ হবে। মিতাক্ষরা দলের মতই তাদের সামান্য পৃথক এক ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই মেয়েরা সম্পত্তি পাবে সেখানে পুরো অধিকারেই পাবে ; নতুন আইনে সম্পত্তি পাবার পর সম্পত্তি নিয়ে মেয়েরা ইচ্ছামত যা ইচ্ছা করতে পারবেন। দান বিক্রী হস্তান্তর প্রভৃতিতে পূর্ণ অধিকার মেয়েদের দেওয়া হয়েছে—যেমনটি ছেলেরা আগে ভোগ করতেন।

কারা ওয়ারীশ হবেন ঃ কারা ওয়ারীশ হবেন ঠিক করার আগে দেখতে হবে সম্পত্তির মালিক পুরুষ হলে তাঁর ওয়ারীশের তালিকা অন্য রকম হবে। আইনে পুরুষ মালিকের ওয়ারীশদের তালিকা এবং মেয়ে মালিকদের ওয়ারীশদের তালিকা আলাদা আলাদা করে দেখান হয়েছে।

পুরুষ মালিকের সম্পত্তির ওয়ারীশ ঃ এই আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী যাঁরা পুরুষ মালিকের সম্পত্তির ওয়ারীশ হবেন তাঁদের তালিকা নীচে দেওয়া হল।

(এই তালিকায় দুটি শ্রেণী করা হয়েছে ফাস্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাস বা প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী। এঁদের পুরো পরিচয় পরে দেওয়া হচ্ছে।)

(ক) প্রথম ধরতে হবে ফাস্ট ক্লাস বা প্রথম শ্রেণীতে যাঁদের পরিচয় দেওয়া আছে সেই সব আত্মজ বা নিকট বিবাহ সম্বন্ধ সবাই এক সঙ্গে একই সময়ে মালিক হবেন।

(খ) তারপর দেখতে হবে, প্রথম শ্রেণীর কোন ব্যক্তি যদি

না থাকেন বা জীবিত না থাকেন তাহলে সেকেণ্ড ক্লাস বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাঁদের পরিচয় দেওয়া আছে তাঁরা পর পর এবং কোথাও কোথাও একসঙ্গে সম্পত্তি পাবেন।

(গ) তৃতীয়ত দেখতে হবে ফার্ষ্ট ক্লাস বা সেকেণ্ড ক্লাস ওয়ারীশ তালিকায় যদি কেউ না থাকেন তাহলে সম্পত্তি কারা পাবেন। সম্পত্তি তাহলে মৃত পুরুষের সঙ্গে যে ব্যক্তির পুরুষ জ্ঞাতির মধ্যে দিয়ে রক্তের সম্বন্ধ আছে বা দত্তক হিসাবে পুরুষ জ্ঞাতির মধ্যে সম্বন্ধ হয়েছে, সেই ব্যক্তি পাবেন।

(ঘ) আর শেষ পর্যন্ত যদি ওপরের তৃতীয় দফায় কোন ওয়ারীশ না পাওয়া যায় তাহলে নতুন ওয়ারীশ খুঁজতে হবে, মৃত পুরুষটির সঙ্গে যাঁর রক্তের বা দত্তক সম্বন্ধ শুধু পুরুষ আত্মীয় মারফৎ নয়, মহিলা আত্মীয় মারফৎও হয়েছে, সেই সব ব্যক্তি ওয়ারীশ হবেন।

মেয়ে মালিকদের ওয়ারীশঃ সম্পত্তির মালিক যদি মহিলা হন তাহলে তাঁর সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর দুভাবে বিলি হবে। মেয়েরা সম্পত্তি দুদিক থেকে পেতে পারেন। এক হচ্ছে তাঁর পিতৃকুল হতে, অর্থাৎ তিনি বাবা বা মার কাছ হতে সম্পত্তি পেতে পারেন। আর দ্বিতীয় হচ্ছে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ হতে বা শ্বশুরের কাছ হতে সম্পত্তি পেতে পারেন।

পিতৃকুল হতে কোন মেয়ে সম্পত্তি পেলে তাকে আগে স্ত্রীধন বলা হত। স্ত্রীধন অন্যভাবেও মেয়েরা পেতেন। সেই স্ত্রীধনের মালিক মারা গেলে কারা সেই সম্পত্তি পাবেন তার আলাদা আলাদা তালিকা ছিল। এখন সে সব তালিকা উঠে গিয়ে নতুন তালিকা হয়েছে। অর্থাৎ এই আইনের বলে স্ত্রীধন বলে আর কিছু রইল না। আর স্ত্রীধনের মেয়ে মালিক

স্ত্রীধনের ওপর পুরো অধিকার পেলেন। সে বিষয় পরে বলা হচ্ছে।

সাধারণভাবে মেয়ে মালিকের ওয়ারীশ ঃ মেয়ে মালিকদের সম্পত্তির ওয়ারীশ যাঁরা হতে পারবেন, তাঁদের তালিকা নীচে দেওয়া হচ্ছে। এই আইনের ১৫ ধারায় এই তালিকা পাওয়া যাবে।

(ক) প্রথমে জীবিত পুত্র কন্যা এবং মহিলার স্বামী। মৃত পুত্র কন্যাদের সন্তান সন্ততিও অংশ পাবে। পুত্র কন্যারা এবং স্বামী সমান সমান অংশ এক সঙ্গে পাবেন। আর যদি মৃত পুত্র কন্যাদের সন্তান সন্ততি থাকে তাহলে সেই সন্তান সন্ততিদের বাবা বা মা বেঁচে থাকলে যে অংশ পেতেন সেই অংশ তারা পাবেন।

উদাহরণ ঃ প্রভাবতী এক সম্পত্তির মালিক। তিনি মারা যাবার সময় স্বামী ও দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যার মৃত্যু হয়েছিল। এই মৃত পুত্রের দুই পুত্র, এক কন্যা এবং মৃত কন্যার এক পুত্র, এক কন্যা। তাহলে সম্পত্তি ভাগ হবার সময় দেখতে হবে মহিলার মৃত্যুর সময় সব পুত্র কন্যা জীবিত থাকলে কতজন হতেন। এখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর তিন পুত্র (দুই জীবিত এবং বর্তমানে এক মৃত) এবং দুই কন্যা (এক জীবিত এবং বর্তমানে এক মৃত) এই পাঁচ পুত্র কন্যা সম্পত্তি ভাগের সময় থাকেন। এই পাঁচ পুত্র কন্যাদের সঙ্গে স্বামীর নামও যোগ হবে। তাহলে ওয়ারীশ হলেন স্বামীকে নিয়ে ছয়জন। তাহলে মহিলার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি সমান ছয় ভাগ হবে। এক এক ভাগ পাবেন দুই জীবিত পুত্র ও এক জীবিত কন্যা ও স্বামী। এই চারভাগ

দেবার পর বাকী দুই ভাগ সমান সমান দেওয়া হবে মৃত ছেলের ও মৃত মেয়েব সন্তান সন্ততিদের। অর্থাৎ বাকী দুই ভাগ মৃত ছেলের দুই পুত্র ও এক কন্যা নিজেদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে নেবেন এবং শেষ এক ভাগ মৃত কন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা নিজেদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে নেবেন।

(খ) দ্বিতীয়ত, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী কেউ না থাকলে স্বামীর ওয়ারীশরা ঐ সম্পত্তি পাবেন।

(গ) তারপরে আসবেন মা ও বাবা।

(ঘ) তারপর আসবেন বাবার উত্তরাধিকারীরা।

(ঙ) শেষকালে আসবেন মার উত্তরাধিকারীরা।

(উত্তরাধিকারীদের তালিকা পর পর দেওয়া হল। যে ভাগে একের বেশি ব্যক্তি আছেন সেখানে সবাই একসঙ্গে পাবেন)।

বাবা বা মার কাছ হতে সম্পত্তিঃ কোন মহিলা যদি তাঁর বাবা বা মার কাছে হতে সম্পত্তি পান এবং মৃত্যুকালে যদি তাঁর কোন পুত্র বা কন্যা না থাকে অথবা মৃত পুত্র বা কন্যার কোনও সন্তান সন্ততি না থাকে তাহলে এই মহিলার সম্পত্তি তাঁর পিতার উত্তরাধিকারীরা পাবেন—ওপরে যেমন পাঁচভাগে দেখান হয়েছে সে ভাবে ভাগ হবে না।

(এ কথা পরিষ্কার জানা দরকার ছেলে মেয়ে থাকলে, বা না থাকলে ছেলে বা মেয়ের ছেলে মেয়ে সম্পত্তি পাবে। তারা না থাকলে অন্য কথা)।

স্বামী বা শ্বশুরের কাছ হতে সম্পত্তিঃ কোন মহিলা যদি তাঁর স্বামী বা শ্বশুরের কাছ থেকে সম্পত্তি পান, তাহলে তাঁর মৃত্যুর পর যদি কোন পুত্র বা কন্যা জীবিত না থাকে বা কোন

মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তান সন্ততি না থাকে তাহলে সম্পত্তি চলে যাবে স্বামীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। ওপরে যে পাঁচটা তালিকা ১৫ (১) ধারায় দেওয়া আছে সে সব তালিকার প্রথম অংশ ছাড়া অন্য সব বাদ যাবে।

পুরুষের সম্পত্তির ওয়ারিশ: পুরুষের সম্পত্তির ওয়ারীশ কারা হবেন সে বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে। এখন ওয়ারীশদের মধ্যে কারা ফাস্ট ক্লাশ (প্রথম শ্রেণী) আর কারা সেকেণ্ড ক্লাশ (দ্বিতীয় শ্রেণী) দেখা যাক।

ফার্ষ্ট ক্লাস: পুত্র, কন্যা, বিধবা পত্নী, মা, যে কোন মৃত পুত্রের পুত্র, যে কোন মৃত পুত্রের কন্যা, যে কোন মৃত কন্যার পুত্র, যে কোন মৃত কন্যার কন্যা, মৃত পুত্রের বিধবাপত্নী, মৃত পুত্রের পুত্র মৃত হলে তার পুত্র (অর্থাৎ কর্তার ছেলের নাতি), মৃত পুত্রের পুত্র মৃত হলে তার কন্যা (কর্তার ছেলের নাতনী) মৃত পুত্রের পুত্র জীবিত না থাকলে তার বিধবা পত্নী (কর্তার বিধবা নাতবৌ)।

এঁরা প্রত্যেকেই এক সঙ্গে সমান সমান অংশ পাবেন। কর্তার একাধিক স্ত্রী যদি থাকেন এবং একই সময় বিধবা হন, তাহলে সেই বিধবারা সবাই মিলে একটা অংশ ভাগ করে নেবেন।

সেকেণ্ড ক্লাস: (ফার্ষ্ট ক্লাসের কেউ না থাকলে সেকেণ্ড ক্লাসের ওয়ারীশরা আসবেন। তালিকার সম্বন্ধ পর পর দেওয়া আছে। এই তালিকার ১নং এ কেউ না থাকলে ২নং তালিকায় নারী পুরুষে পাবেন। ২নং এ কেউ না থাকলে ৩নং এর তালিকায় যাঁরা আছেন তারা পাবেন। এইভাবে তালিকার নাম নির্বাচন হবে। এই তালিকায় যে নম্বরে একাধিক পুরুষ

বা নারী আছেন তাঁরা সকলে একসঙ্গে সমান সমান অংশ পাবেন।

১। পিতা।

২। (ক) ছেলের মেয়ের ছেলে (খ) ছেলের মেয়ের মেয়ে, (গ) ভাই, (ঘ) ভগিনী।

৩। (ক) মেয়ের ছেলের ছেলে (খ) মেয়ের ছেলের মেয়ে (গ) মেয়ের মেয়ের ছেলে (ঘ) মেয়ের মেয়ের মেয়ে।

৪। (ক) ভাইয়ের ছেলে (খ) ভগিনীর ছেলে (গ) ভাইয়ের মেয়ে (ঘ) ভগিনীর মেয়ে।

৫। কর্তার বাবার বাবা (ঠাকুরদা), বাবার মা (ঠাকুরমা)।

৬। কর্তার বাবার বিধবা বা সৎমা ; ভাইয়ের বিধবা।

৭। (ক) বাবার ভাই (জেঠা বা খুড়ো) ; (খ) বাবার ভগিনী (পিসিমা)।

৮। (ক) মার বাবা (দাদামহাশয়) ; (খ) মার মা (দিদিমা)।

৮। (ক) মার ভাই (মামা), (খ) মার ভগিনী (মাসীমা)।

[এইখানে ভাই বা বোন বলতে প্রথমে পিতার ঔরসে ও এক মাতার গর্ভে ধরতে হবে। কিন্তু মাতার ভিন্ন ভিন্ন স্বামীর ঔরসে জন্ম ভাই হলে হবে না। সহোদর ভাই বা বিমাতার গর্ভে এক পিতার ঔরসে হলে গণ্য করা হবে কিন্তু ভাই হিসেবে ওয়ারীশ হ'লে সহোদর ভাইদের দাবী আগে।]

৩৫ জন ওয়ারীশদের মধ্যে ২০ জন নারী ঃ উপরে যে ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাস ওয়ারীশদের তালিকা দেওয়া হল, সেই তালিকায় দেখা যাবে ৩৫ রকমের ওয়ারীশদের মধ্যে ২০ জন হচ্ছেন মেয়ে এবং বাকী ১৫ জন পুরুষ। তাহলে বোঝা

যাবে স্বাধীন ভারতে উত্তরাধিকার আইনে কত বদল হয়েছে এবং মেয়েরা কত বড় এবং সংখ্যায় কত বেশী সত্ত্ব পেয়েছেন। আগে ৫৩ জনের মধ্যে পাঁচ জন মেয়ে ওয়ারীশ ছিলেন পরে তিন জন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আগে সম্পত্তিতে মেয়েদের পুরো অধিকার দেওয়া হত না। এই আইনে ১৯৫৬ সাল থেকে তাঁদের পুরো অধিকার দেওয়া হল।

[ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাস ওয়ারীশদের তালিকার চার্ট এই পুস্তকে অন্য জায়গায় দেখুন।]

মেয়েদের সব সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার ঃ ১৯৫৬ সালের উত্তরাধিকার আইনে ১৪ নং ধারায় মেয়েদের খুব বড় একটা অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল। এই আইন পাশ হবার আগে অনেক মেয়েদের দখলে এমন অনেক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ছিল যার ওপর তাঁদের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল না। যেমন ১৯৩৭ সনের ১৮ নং আইনে (হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তিতে অধিকার আইন) মেনে নেওয়া হল যে কর্তা গত হলে তাঁর বিধবা স্ত্রী, বিধবা পুত্রবধূ ও বিধবা নাতবৌ সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারীশ হবেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালের আইনে এঁদের পূর্ণ সত্ব দেওয়া হয়নি। এই সব বিধবা মহিলা তখন কেবল সম্পত্তির আয়টুকু ভোগ করতে পারতেন। ১৯৫৬ সালের আইন পাশ হবার পর যাঁরা এই গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন, সম্পত্তিতে পূর্ণ সত্ব পাননি, তাঁরা এই আইনের ১৪ ধারার বলে পূর্ণ অধিকার বা পূর্ণ সত্ব পেয়ে গেলেন। এই আইন পাশ হবার পর যদি কোন মেয়ে কোন সম্পত্তি পান তাহলে তাতেও তাঁর পূর্ণ সত্ব থাকবে।

এখানে সম্পত্তি মানে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি হিন্দু মেয়ে যে ভাবেই পেয়ে থাকুন তার পূর্ণ সত্ব তাঁর

হবে। সেই সম্পত্তি হিন্দু মেয়েরা এই সব কারণে পেতে পারেন ঃ

(১) ওয়ারীশ হিসাবে, বা সম্পত্তি ভাগ করে (২) খোর-পোষের বাকী বকেয়া হিসাবে বা খোরপোষ হিসাবে (৩) তাঁর বিবাহের পূর্বে বা পরে আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে কোন ব্যক্তির কাছ হতে দান হিসাবে যদি কিছু পান, (৪) নিজের পরিশ্রমে ও কুশলতায় যদি অর্জন করেন (৫) খরিদ করেন বা (৬) অ. যে কোন উপায়ে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পান তাহলে তিনি সেই সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পূর্ণ মালিক হবেন এবং তাতে তাঁর পূর্ণ সত্ব থাকবে।

স্ত্রী-ধন হিসাবে এতদিন তাঁর কাছে যা ছিল তার ওপরও তাঁর পূর্ণ সত্ব এখন হতে বর্তাল।

[অবশ্য দান পত্রে বা উইলে অথবা আদালতের কোন রায়ে বা কোন নিষ্পত্তিতে যদি কোন সর্ত বিশেষভাবে আরোপ করা থাকে তাহলে সেই সর্ত মানতে হবে। এরূপ কোন বিশেষ সর্ত না থাকলে মেয়েরা ১৯৫৬ সালের উত্তরাধিকার আইনের আগে বা পরে যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি পেয়ে থাকবেন বা পাবেন তার ওপর তাঁদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে।]

নতুন আইনে মেয়েদের আরও সুবিধা ঃ ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মেয়েদের আরও কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হ'ল।

(১) **গর্ভস্থ সন্তানের অধিকার ঃ** এই আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী সম্পত্তির মালিক, কর্তার মৃত্যুর সময় ওয়ারীশদের

মধ্যে কোনও মেয়ে যদি গর্ভবতী থাকেন এবং মৃত্যুর পর যদি সেই মহিলার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে সেই শিশুও উত্তরাধিকারীদের তালিকায় যথাযোগ্য স্থান পাবে। আইনত মনে করা হবে যে সেই শিশু কর্তার মৃত্যুর পূর্বে জন্মালে যে অধিকার পেত এখন কর্তার মৃত্যুর পর জন্মালেও সেই একই অধিকার পাবে। আর সেই অধিকার কর্তার মৃত্যুর দিন হতে বলবৎ হবে।

উদাহরণঃ কর্তা অল্প বয়সে অর্থাৎ ৩০।৩৫ বৎসর বয়সে গত হলেন এবং সেই সময় তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তার কিছুদিন পর শিশু পুত্র জন্মালে সেই শিশুপুত্র কর্তার পুত্র হিসাবে বা কন্যা হলে কন্যা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর ওয়ারীশ হবে এবং তার অধিকার কর্তার মৃত্যুর দিন হতে গণনা করা হবে।

(২) **রোগ ভোগ কাণা খোঁড়া কেউ বাদ যাবে নাঃ** ২৮ নং ধারা অনুযায়ী অন্য কোনও কারণ না থাকলে কোনও ওয়ারীশকে কোন ব্যাধির জন্য, অঙ্গহানি বা অঙ্গ বিকৃতি বা অন্ধ হলে তাকে ওয়াবীশ হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

পুরাতন হিন্দু আইনে কোনও ওয়ারীশ যদি অন্ধ হতেন, কালা বা বোবা হতেন, কোন অঙ্গ হানি হত, উন্মাদ হতেন বা বোধশূন্য হতেন অথবা কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে (যথা কুষ্ঠ বা পারদজনিত রোগ—গোপন রোগে) ভুগতেন তাহলে সম্পত্তির ওয়ারীশ তালিকা হতে বাদ পড়তেন। ১৯২৮ সালে এই আইন কিছু বদলিয়ে বলা হয় যদি কেউ জন্মকালে উন্মাদ বা বোধশূন্য থাকতেন তাহ'লেই তাঁর ওয়ারীশের অধিকার খারিজ হবে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের আইনের ফলে এই সমস্ত রোগ

বা অঙ্গহানির কারণে কাউকে ওয়ারীশের তালিকা হতে বাদ দেওয়া যাবে না।

(৩) **কুমারী, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েদের পৈত্রিক ভিটায় স্থান:** আইনের ২৩ ধারা মতে, সম্পত্তির কোনও মালিক মৃত্যুকালে যদি বাস-গৃহ রেখে যান, এবং তাঁর মৃত্যুর সময় যদি প্রথম শ্রেণীর পুরুষ ওয়ারীশ থাকেন এবং সেই বাড়ীতে ঐ পরিবারের লোকজন বাস করেন তাহলে কোন মহিলা ওয়ারীশ এই বসতবাটীর ভাগ বাঁটোয়ারার কথা ওঠাতে পারবেন না। ভাগ বাঁটোয়ারার কথা তখনই উঠবে যখন ওয়ারীশরা নিজের নিজের অংশ বুঝে নিতে বসতবাটীর ভাগ করতে চাইবেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর মেয়ে ওয়ারীশ ঐ বাড়ীতে বসবাস করবার অধিকার পাবেন।

অবশ্য যদি এরকম মেয়ে ওয়ারীশ মৃত মালিকের কন্যা হন এবং তিনি যদি অবিবাহিতা থাকেন, বা স্বামী পরিত্যাক্তা বা স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হন অথবা স্বামী-হারা বিধবা হন তাহলেই সেই কন্যার শুধু ঐ বসতবাটীতে বাস করার অধিকার থাকবে।

[এখানে সম্পত্তির মালিক অর্থে পুরুষ বা মেয়ে মালিক বুঝতে হবে। এই আইনের ২৩ ধারার বলে মালিকের অসহায় কন্যার বসবাসের জন্য যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তাতে কন্যা স্থানীয়া মেয়ে ওয়ারীশ খুব বড় একটা সুবিধা পেয়েছেন।]

বিধবা বিবাহ ও পূর্ব সম্পত্তিতে অধিকার: যদি কোন বিধবা পুত্রবধূ বা বিধবা নাত বৌ অথবা বিধবা ভ্রাতৃবধূ ওয়ারীশদের অধিকার পাবার দিন শুরু হওয়ার আগে পুনরায় বিবাহ করেন তাহলে এই আইনের ২৪ ধারা মতে তিনি তার পূর্ব পরিবারের ওয়ারীশদের তালিকা হতে বাদ পড়বেন।

এই বাদ দেওয়ার কারণ হিসাবে বলা যায় এই সব বিধবারা মালিকের সম্পত্তিতে যে সত্ব পান তা হল স্বামীর অধিকারের ভিত্তিতে। সুতরাং পূর্ব স্বামীর ঘর ত্যাগ করে অন্য স্বামীর ঘরে গেলে তিনি তাঁর প্রথম স্বামীর প্রাপ্য অংশ ভোগ করার অধিকারী থাকবেন না। এখানে বলে রাখা ভাল যে ঐ বিধবা পুত্রবধূ, নাত বৌ বা ভ্রাতৃবধূ সম্পত্তির অংশ দখলে পাবার পর এই প্রশ্ন আর উঠবে না। কারণ এই সব বিধবারা সম্পত্তির অংশে যখন দখল পেয়েছেন তখন তাঁরা নিজ নিজ অংশে পূর্ণ অধিকার বা পূর্ণ সত্ত্বা পেয়ে গিয়েছেন। সুতরাং এই সম্পত্তির অংশ পাবার পর এই বিধবারা পুনরায় বিবাহ করতে পারেন এবং তার জন্য তাঁরা যে সম্পত্তি ইতিমধ্যে পেয়েছেন তার অধিকারের হেরফের হবে না।]

ধর্ম পরিবর্তনের ফল ঃ এই আইনের ২৬ ধারায় বলা হচ্ছে যে কোন ব্যক্তি এই আইন পাশ করার পরে বা আগে যদি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আইনমতে আর হিন্দু না থাকেন তাহলে কি হবে পুরুষ বা মেয়ে যেই হউন, তাঁর সন্তান সন্ততি যদি পিতা বা মাতার ধর্মান্তরের পরে জন্ম-গ্রহণ করলে সেই সব সন্তান বা তাঁর বংশধরেরা হিন্দু আত্মীয়ের সম্পত্তি ওয়ারীশদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে। অবশ্য এই হিন্দু সম্পত্তি আইনত ওয়ারীশদের দখলে যাওয়ার পূর্বে যদি এই সব ছেলে মেয়ে বা তাদের বংশধরেরা (যাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে) হিন্দু বলে গণ্য হয়, তাহলে আইন অনুযায়ী ওয়ারীশদের তালিকায় তাদের নাম আসার সম্ভাবনা থাকলে তাদেরও নাম ওয়ারীশদের তালিকায় যাবে। কিন্তু সেই সম্পত্তি ওয়ারীশদের দখলে যাবার দিন পার হবার পর এই সব ছেলে

মেয়ে হিন্দু ধর্মে আবার দীক্ষিত হলে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ পাবে না।

কৃষি জমি : এই আইনের ৪ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে কৃষি জমিকে টুকরো করার বিপক্ষে যদি কোন আইন থাকে বা কৃষি জমির উচ্চ সীমা বা জমির প্রজা-সত্ব ঠিক করার যে সব আইন আছে, সে সব আইন ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন মতে কোন বদল হবে না।

স্ত্রী-ধন : ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাশ হবার আগে হিন্দু-মেয়েদের স্ত্রী-ধন সম্পত্তি বলে একরকম সম্পত্তি ছিল। মনু থেকে আরম্ভ করে অনেকে এই স্ত্রী-ধনের কথা বলেছেন। স্ত্রী-ধনে অনেক রকমের ব্যাখ্যা আছে। স্ত্রীর সব সময় যে পূর্ণ অধিকার থাকতো তা নয়। স্ত্রী নিজের পরিশ্রমে বা শিল্প কর্মে যদি কিছু টাকা রোজগার করতে পারতেন তাহ'লে সব সময় তিনি তাঁর রোজগারের টাকার পুরো মালিক হতে পারতেন না। যৌতুক, অযৌতুক প্রভৃতি স্ত্রী-ধনের আলাদা আলাদা ওয়ারীশ ঠিক হত। এই স্ত্রী-ধন নিয়ে নানা কূট-কচালে বিবাদ আগে হয়ে গিয়েছে।

১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাশ হবার পর এই আইনের ১৪ ধারার বলে যে সব মেয়েদের স্ত্রী-ধন সম্পত্তি ছিল তাঁরা সেই সব সম্পত্তির পুরো মালিক হয়ে গেলেন। এর ফলে স্ত্রী-ধন সম্পর্কে আইনের সব ধারা অকেজো হয়ে গিয়েছে।

সুফল : ১৯৫৬ সালের আগে হিন্দুরা সম্পত্তি থেকে তাদের মেয়েদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এবং পরে সম্পত্তিতে অংশ দিয়েও কেড়ে নেবার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। স্বাধীনতার পর নেহেরু সরকার সে সবের আমূল সংস্কার

করেছেন। এখন থেকে বিধবা স্ত্রী, মেয়ে, ছেলের বিধবা বৌ, আর নাতির বিধবা বৌ, মা, মৃত ছেলের মেয়ে, মৃত মেয়ের মেয়ে এবং নাতির মেয়ে (ছেলের ছেলের মেয়ে) ছেলের সঙ্গে একই সময় এক সঙ্গে সবাই সম্পত্তির সমান অংশ পাবেন। এই সঙ্গে আরো তিন জনের সমান ভাগ আছে। তাঁরা হলেন মৃত ছেলের ছেলে, মৃত মেয়ের ছেলে এবং মৃত ছেলের নাতি—এবং সবাই প্রথম শ্রেণীর ওয়ারীশ। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাবা, ভাই বোন, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, দাদামশায়, দিদিমা, মামা, মাসী, এবং মেয়েদের তরফের অনেককে ওয়ারীশের মধ্যে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মোট পঁয়ত্রিশ রকমের ওয়ারীশের মধ্যে কুড়িজন হলেন মহিলা আর পনের জন হলেন পুরুষ। এটা গেল পুরুষদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে। মেয়েরা যে সম্পত্তি পাবেন তারও উত্তরাধিকার তালিকা আগে জানান' হয়েছে। আগে মেয়েদের এ অধিকার ছিল না। আগে মেয়েদের হাতে সম্পত্তি এলে, সেটা ঘুরে ফিরে ছেলেদের কাছে চলে যেত। কারণ তখন মেয়েদের সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার ছিল না।

নতুন আইনে মেয়েদের মনে নতুন সাহস নতুন ভরসা ও নতুন আশার আলো জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে হিন্দু সমাজের কল্যাণ আসবে, কারণ মেয়েদের কল্যাণ বাদ দিয়ে সমাজে কল্যাণ আনা যায় না। হিন্দু মেয়েরা এখন আত্ম-বল ফিরে পেলেন এবং আত্ম-সম্মান রক্ষা করার সুযোগ পেলেন।

[এখানে একটি বিষয় জানান দরকার। যাঁরা ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইন অনুযায়ী বিবাহ করবেন তাঁরা

১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের আওতায় আসবেন না। সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে তাঁদের বেলায় ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন মানা হবে। এ বিষয় আমরা পরে আলোচনা করব। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে মেয়েদের বহু অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।]

হিন্দু বিবাহ

হিন্দু বিবাহ অনেক প্রাচীন যুগ হতে চলে আসছে। সেই বিবাহের ব্যবস্থা বরাবর একই ছিল তা নয়। যুগে যুগে তার কিছু কিছু বদল হয়েছে। হিন্দু বিবাহে অনেক আচার আছে। আমাদের ভারতবর্ষের লোকেরা নানা ভাষায় কথা বলেন—কেউ বাঙলায়, কেউ হিন্দীতে, কেউ গুরুমুখীতে কেউ গুজরাতীতে, কেউ মারাঠী, মালায়ালী, কানাড়া, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, আসামী, আদিবাসী এবং আরো অনেক ছোট খাটো সম্প্রদায় নানা ভাষা ব্যবহার করেন। এত ভাষাভাষী লোকের মধ্যে নানা রকমের আচার বিচার থাকবে এটা জানা কথা। বিবাহেরও নানারকম প্রথা আমাদের দেশে চালু ছিল। কিন্তু সব জায়গাতেই হিন্দু-বিবাহে কয়েকটা মিল দেখা যায়। যেমন— কন্যাদান বা কন্যা-সম্প্রদান, হোমের আগুন এবং সপ্তপদ গমন। এই তিনটি সব হিন্দু-বিবাহে দেখা যায়। ভারতবর্ষে চিরকালই মোটামুটি সমস্ত হিন্দুর বিবাহে এই তিনটি বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছে, আজও দেওয়া হয়।

প্রচীনকালে হিন্দুদের মধ্যে আট রকমের বিবাহ প্রথা চালু ছিল, তার মধ্যে চারটিকে পছন্দ করা হত এবং চারটিকে আমল দেওয়া হ'ত না। যাই হোক, হিন্দু বিবাহকে আগে সকলে পবিত্র মিলন বলে মনে করতেন এবং এ বিবাহ ধর্ম রক্ষার জন্য মেনে নিতেন। আমাদের দেশে বিবাহকে কেউ ছোট করে দেখেননি এবং বহু প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা বিবাহকে মানুষের কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছেন। জগৎ সৃষ্টিতে নরনারীর

মিলন প্রয়োজন এ কথাও তাঁরা ব'লেছেন। তাঁরা বিবাহকে ঘৃণা করেননি। বরং উপনিষদে বলা হয়েছে, বিবাহ করা দরকার, মানুষ নানা কাজ কর্মের মধ্যে সৃষ্টির গতিকে জিইয়ে রাখবেন। তিনি ছেলের মুখ দেখবেন, নাতিরও মুখ দেখবেন। সুতরাং সব দেশের মত আমাদের দেশে বিবাহে উৎসব ও আনন্দ হয়।

বিবাহ আনন্দের বিষয়। তাকে ঘিরে কোন পীড়ন বা অপচয় যেন না হয় হিন্দু সমাজের সকলের সেটা দেখা উচিৎ। এই কথাটা বলার কারণ আছে। দেখা গেছে হিন্দু বিবাহের আইন কানুন এবং তার দায়-দায়ীত্ব বেশ কিছু এক পেশে ছিল। বিবাহের পর অনেক দুঃখের দুর্গ এদেশে অনেক জায়গায় গড়ে উঠেছিল। সেই সব দুর্গে বন্দিনী ছিলেন মেয়েরা। তার মানে দুঃখের বোঝাটা মেয়েদের মাথাতেই বেশি চাপান হয়ে আসতো। যেমন ধরুন আগেকার দিনে, বিয়ের পর স্বামী ইচ্ছে করলেই বউ বেঁচে থাকতে আবার একটা বিয়ে করে নতুন বৌ ঘরে আনতে পারতেন। দু'টো বউ কেন, একশো বছর আগে একই কর্তার জলজ্যান্ত তিন চারটে বউ থাকতো। তিন চারটে তো কম হ'ল। এমন দিন গেছে যখন বড় কুলীন খাতা বগলে করে গাঁয়ে গাঁয়ে একটার পর একটা বিয়ে করে আসতেন। সারা জীবনে তাঁর যেন বিয়ে করাটাই কাজ। খাতার মধ্যে বৌয়ের নাম আর শ্বশুর বাড়ীর ঠিকানা থাকতো। কুলীন মহারাজ বৎসরান্তে একবার কিংবা দু'বছরে একবার স্ত্রীকে দর্শন দিতে যেতেন। জামাইয়ের দর্শনীরও ব্যবস্থা থাকতো। তাই কুলীনের কাছে বিয়ে একটা পেশা হয়ে গিয়েছিল। ষাট বছরের বুড়ো কুলীন ১০ বছরের মেয়েকেও

বিয়ে করে টাকা নিয়েছে এ রকম অনেক ঘটনা এদেশে ঘটেছে। কিন্তু ধর্মপত্নীর বেলায় অন্য নিয়ম। তাঁর একই স্বামী, একই দেবতা। স্বামী শত গণ্ডা বিয়ে করুন। পত্নীর জীবনে কিন্তু একটাই বিয়ে ছিল। অনেক পরে অবশ্য পতি গত হলে বিধবা বিবাহ আইনে জারী হয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগ খুব কম হিন্দু বিধবাই নিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বহু ক্ষেত্রে হিন্দু মেয়েরা নীরবে পীড়ন সহ্য করে এসেছেন।

আর এক দিক দেখা যাক। হিন্দুদের এতদিন ধারণা ছিল, বিবাহ বন্ধন কখনই ছিন্ন হতে পারে না। সুতরাং আগে কোন হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা ভাবতে পারতেন না। স্বামী যদি পরস্ত্রীতে আসক্ত হন, কিংবা স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা এমন কি কুলটা হয়ে যান, তাহলেও স্বামী স্ত্রী কেউই বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারতেন না। বিবাহ বিবাহ বন্ধন এমনই কঠিন ও চিরস্থায়ী ছিল।

হিন্দু বিবাহ চুক্তি নয়ঃ হিন্দু বিবাহ আবার অন্য অনেক দেশের বিবাহের মত নয়। অন্য দেশে নরনারীর বিবাহকে একটা চুক্তির মত ধরা হয়। চুক্তিতে যেমন দুজনের মধ্যে কতকগুলি সর্ত থাকে, দুজনকে সে সব সর্তগুলি পালন করতে হয়। চুক্তির সর্ত একজন ভাঙলে অপরজন চুক্তি ভেঙে দেবার দোষ দিতে পারেন। বিবাহে সেই রকম চুক্তি ভেঙে দেবার জন্য বিবাহ ভেঙে দেবার দাবী স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ করতে পারেন। কিন্তু হিন্দু বিবাহকে স্বর্গীয় মিলন বলে ধরা হয়। এটাকে চুক্তি ধরা হয় না। সেজন্য হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন কথা আগে কেউ তুলতে পারতেন না। এখন অবশ্য অন্য কথা। সে বিষয় আমরা কিছু পরে আলোচনা

করব। এখন হিন্দু বিবাহের রীতি নীতি আলোচনা করা থাক।

আগেই বলা হয়েছে হিন্দু বিবাহ প্রাচীনকালে আট রকমের ছিল। পরে সেটা দুরকমের হয়। যেমন, ব্রহ্ম বিবাহ আর আসুরীয় বিবাহ। ব্রহ্ম বিবাহ বলা হত, তার কারণ, যে ব্রাহ্মন বেদ পড়েছেন তাঁর বিবাহকে ব্রহ্ম বিবাহ বলা হত। পরে ঠিক হয় যে বিবাহে কন্যা দান করতে কন্যার পিতা বা অভিভাবক কোন অর্থ বা সম্পত্তি নিতেন না সেই বিবাহকে ব্রহ্ম বিবাহ বলা হত। অর্থাৎ যে বিয়েতে কনে বেচা হত না সেই বিবাহকে উঁচুতে স্থান দেওয়া হত।

আর যে বিয়েতে মেয়ের বাপ টাকা নিতেন সেই বিবাহকে আসুরীয় বলা হত। কিন্তু সব ক্ষেত্রে বিয়ের সময় মেয়েকে সাজিয়ে দিতে হত; সালঙ্করা না হলে বিয়ে হত না। আবার বিবাহে মেয়ের সঙ্গে কিছু জিনিষপত্রও যৌতুক দেওয়া হত, এখনও হয়। সেই জিনিস বা যৌতুককে স্ত্রী-ধন বলা হত। যাই হোক, যেখানে মেয়ের বাপ বিয়েতে টাকা বা জিনিষ নিতেন সেই বিয়েকে ছোট করে দেখা হত। আর যে বিয়েতে ছেলের বাপ টাকা, গয়না-গাটি, জিনিষ পত্তর এমন কি সম্পত্তি আদায় করতেন সেটাকে ব্রহ্ম বিবাহ বলে বেশী মর্যাদা দেওয়া হত। বরপণ নিতে দোষ নেই, কণে-পণ হলেই ছোট হয়ে গেলেন! তাই, আমাদের দেশে বর পণ কথাটা বেশী চালু আছে, কণে পণ অত চালু নয়। অবশ্য এখনও অনেক জায়গায় বিয়ে করতে ছেলেকে টাকা দিতে হয়। দেখা যাচ্ছে শাস্ত্র মতে যেটাকে বড় করে দেখান হয়েছে সেটা হল ব্রহ্ম বিবাহ যাতে বরপণ নিতে বাধা নেই, কিন্তু কণে-পণ চলবে না। এটাও

একদিক দিয়ে পুরুষ ঘেঁষা নিয়ম হয়েছে। এখন হিন্দু বিবাহে যে তিনটি কর্তব্য মোটামুটি সকলকে নিশ্চয় পালন করতে হয় সেগুলি আলোচনা করা যাক।

কন্যা-দান বা সম্প্রদান: হিন্দু বিবাহে কন্যা সম্প্রদান বিবাহের একটা বড় অঙ্গ। পুরান কালে বার বছর পার হবার আগেই মেয়ের বিয়ে হত। অনেক সময় ঋতুমতী হওয়ার আগেই কন্যাকে সম্প্রদান করা হত। সুতরাং কন্যার যিনি অভিভাবক তাঁকে সম্প্রদান করতেই হত। কিন্তু হিন্দু-বিবাহ এমনই এক ব্যাপার যে কন্যা নাবালিকা হোক বা সাবালিকা হোক বিয়ে করতে হলে কন্যা সম্প্রদান সকলেই মেনে এসেছেন, এখনও মানেন।

রীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে এর একটা মাধুর্য আছে। মেয়ে বাপের ঘর থেকে শ্বশুর ঘরে স্বামীর সঙ্গে যাবে, এক জীবন থেকে তার আর এক জীবন হবে; তার আগে তার অভিভাবক একটা নিয়ম অনুষ্ঠান করে শুদ্ধ মনে মেয়েকে বরের হাতে সঁপে দেবেন, সম্প্রদান করবেন, নতুন জীবনে প্রবেশ করতে মেয়েকে দীক্ষা দেবেন—এটা ভাল রীতি। এটা একটা প্রথা; অভিভাবক না থাকলে বিবাহ হবে না, আইনে একথা বলে না। অবশ্য মেয়ে নাবালক হলে অভিভাবকের সম্মতি চাই।

কারা অভিভাবক হতেন: এখন দেখা যাক কোন কোন অভিভাবক কন্যা-সম্প্রদান করতে পারতেন। মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ মত অনুযায়ী আগে যে নিয়ম ছিল সেই নিয়ম এখানে দেওয়া হচ্ছে।

মিতাক্ষরা	দায়ভাগ
(১) পিতা	(১) পিতা
(২) পিতামহ	(২) পিতামহ
(৩) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা	(৩) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
(৪) পিতৃ রক্তের সম্বন্ধে যাঁরা নিকট	(৪) পিতৃ রক্তের সম্বন্ধে যাঁরা নিকট
(৫) মাতা	(৫) মাতামহ
	(৬) মাতামহী
	(৭) মাতা

[আগের নিয়মে মাতার স্থান সব চেয়ে নীচে ছিল। নতুন আইনে মাতার স্থানকে পিতার পরে দেওয়া হয়েছে।]

মাতার স্থান নীচে থাকলেও আদালতের রায়ে আগে মা'কে সম্মান দেওয়া হত। এমন ঘটনা ঘটেছে যেখানে পিতা উপস্থিত না থাকাতে পিতার অনুমতি না নিয়েই মা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আদালত বলেছেন পিতা উপস্থিত না থাকলেও এবং তিনি অনুমতি না দিলেও দেখতে হবে বিবাহ ঠিক হিন্দু অনুষ্ঠান মতে হয়েছে কিনা। যদি বিবাহের আসল অনুষ্ঠান ঠিক হয়ে থাকে তাহলে পিতার অনুমতি ছাড়াও বিবাহ সিদ্ধ হয়েছে ধরতে হবে। শাস্ত্রকাররা সকলে অবশ্য একথা মানেন না। তাঁরা সম্প্রদানের উপর জোর দেন। কিন্তু মানবতার দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক শাস্ত্রকার একথাও বলেছেন যে বিবাহ ঠিকমত হলে তাকে আর অস্বীকার করা যাবে না। নাবলিকা হলে কন্যা সম্প্রদান করা শাস্ত্রের আদেশ নয়, এটা উপদেশ। উপদেশ কেউ মানেন, কেউ মানেন না। কিন্তু আদেশ হলে মানতেই হবে। যেমন হোমের আগুন আর সপ্ত-পদ গমন

মানতেই হবে, এটা শাস্ত্রের আদেশ। এ না হলে বিবাহ ঠিকমত হয় না। বল প্রয়োগ করে বা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিবাহ হলেও বিবাহ অসিদ্ধ হয়। আদলত সে বিবাহ নাকচ করে দিতে পারেন।

স-বর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহ: একই বর্ণের বিবাহ, পুরাতন শাস্ত্র বেশী পছন্দ করত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পাত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণী পাত্রীর বিবাহ, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যর সঙ্গে বৈশ্য আর শূদ্রের সঙ্গে শূদ্র। একে স-বর্ণ বিবাহ বলা হয়। অবশ্য কোন মতেই পাত্র এবং পাত্রী স-পিণ্ড হবে না। পুরাতন মতে তাঁরা সগোত্রও হতে পারতেন না।

অসবর্ণ বিবাহ পুরাকালে যে হতনা, তা নয়। অসবর্ণ বিবাহের অনেক নজির আছে। সেজন্য শাস্ত্রকাররা অসবর্ণ বিবাহ শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন এবং তাকে দুটো ভাগ করেছেন—প্রতিলোম বিবাহ আর অনুলোম বিবাহ।

প্রতিলোম ও অনুলোম বিবাহ: মেয়ে যদি ব্রাহ্মণ হয় আর ছেলে যদি ক্ষত্রিয় হয়, তাহলে তাদের বিবাহকে প্রতিলোম বলা হয়; আর ছেলে যদি ব্রাহ্মণ হয় আর মেয়ে যদি ক্ষত্রিয় বা শূদ্র হয় তা হলে তাকে অনুলোম বিবাহ বলা হবে। এই সব অসবর্ণ বিবাহ গোঁড়া হিন্দুরা পছন্দ করতেন না এবং সহজে মেনে নিতেন না। এই নিয়ে অনেক জায়গায় মামলা মকদ্দমা হয়েছে এবং বেশীর ভাগ জায়গায় প্রতিলোম বিবাহকে আদালত মানেননি, কিন্তু অনুলোম বিবাহকে হিন্দু বিবাহ বলে মেনে নিয়েছেন। এই ব্যাপারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণের ছেলে শূদ্রের মেয়েকে ঘরে আনতে পারতেন কিন্তু শূদ্রের ছেলে ব্রাহ্মণের মেয়েকে হিন্দু ধর্ম্মমতে বিবাহ করতে পারতেন না।

প্রাচীন হিন্দু আইনে এ রকম বহু অসবর্ণ বিবাহ হত, বিশেষ করে অনুলোম বিবাহ। হিন্দুরা সাধারণত চারিটি বর্ণ (জাত) মেনে নেয়। যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। প্রাচীন-কালে যখন হিন্দু আইনে অনুলোম বিবাহ হত, তখন তাঁদের ছেলে মেয়ে বাবার জাতিতে উঠতে পারত না। যেমন ব্রাহ্মণ পিতা এবং ক্ষত্রিয় মাতা হলে. তাঁদের ছেলেকে আর ব্রাহ্মণ বলে ধরা হতো না। ছেলে বাবা আর মায়ের মাঝামাঝি একটা নতুন জাতের পত্তন করতো। এ রকম ভাবেই মূর্ধা—বাসিক্ত, অম্বষ্ঠ, নিসাদ, মাহিষ্য, উগ্র, কারাণা প্রভৃতি নতুন নতুন জাতের স্থষ্টি হয়েছে।

১৯৫৫ সালের নতুন হিন্দু বিবাহ আইনে অসবর্ণ বিবাহে কোন বাধা নেই, সে কথা আমরা পরে বলবো।

বিবাহ কোথায় নিষিদ্ধ ঃ হিন্দু বিবাহ যে কোন মেয়ে আর যে কোন ছেলের সঙ্গে হতে পারে না। তাদের আত্মীয় গোষ্ঠীর পরিচয় জানা দরকার। মেয়ের পিতৃ-পরিচয় ও মাতৃ-পরিচয় এবং ছেলেরও পিতৃ-পরিচয় ও মাতৃ-পরিচয় ভাল করে জেনে তবে বিয়ের ঠিক হবে। পরিচয় মানে বংশ পরিচয়। আর বংশ পরিচয় মানে পিতার দিক আর মাতার দিক, উভয় দিক থেকে পরিচয় জানা দরকার। জানা দরকার মেয়ে ও ছেলের মধ্যে সপিণ্ড সম্বন্ধ আছে কিনা। সপিণ্ড কারা ? এ বিষয় নিয়ে দায়ভাগ দলের আর মিতাক্ষরা দলের মধ্যে সামান্য তফাৎ আছে। আগেই বলা হয়েছে দায়ভাগ মত শুধু বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে চলে, আর মিতাক্ষরা মত চলে ভারতবর্ষের অন্য সব জায়গায়. হিন্দুদের মধ্যে। এখন দুই মত দেখা যাক।

দায়ভাগ মতে ঃ

(ক) দায়ভাগ মতে মেয়ে যদি ছেলের বাপের অধস্তন (নীচের দিকে) পুরুষের সাত পুরুষের মধ্যে জন্মে বা ছেলের বাপের ছয় পূর্ব পুরুষের মধ্যে (উপর দিকে) জন্মায় তাহলে তাদের বিবাহ হবে না।

(খ) আবার মেয়ে যদি ছেলের দাদামশায় থেকে অধস্তন পাঁচ পুরুষের মধ্যে বা দাদামহাশয়ের চার পূর্ব পুরুষের মধ্যে জন্মায় তাহলেও বিয়ে হবেনা।

(গ) পিতৃ-বন্ধু (ভিন্ন-গোত্রীয় আত্মীয়) হলে নীচে সাত পুরুষ আর ওপরে ছয় পুরুষের মধ্যে যদি ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ পাওয়া যায় তাহলে বিয়ে হবে না।

(ঘ) মাতৃ-বন্ধু হলে নীচে পাঁচ পুরুষ আর ওপরে চার পুরুষের মধ্যে মেয়ে ও ছেলের মধ্যে সম্বন্ধ বার হলে চলবেনা।

একমাত্র সুবিধা দেওয়া হয়েছে ওপরের সম্বন্ধের মধ্যে যদি দেখা যায় মেয়ের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধের মধ্যে পূর্বপুরুষ বা অধস্তন পুরুষে তিনবার গোত্র বদল হয়েছে তাহলে সেখানে বিয়ে হতে পারে।

মিতাক্ষরা মতে ঃ

মিতাক্ষরা মতে ঠিক ছিল যদি দেখা যায় মেয়ে ও ছেলের উভয়ের পিতাদের দিকে সাতটা পূর্ব পুরুষের কোথাও এক পূর্ব পুরুষ ছিলনা, তাহলে বিয়ে হ'তে পারে। সেই রকম ছেলের মায়ের ও মেয়ের মায়ের দিক থেকেও পাঁচ পূর্ব পুরুষে কোথাও এক পূর্বপুরুষ না দেখা দিলেও বিবাহ হবে।

এই সপিণ্ড বিবাহের বিধি নিষেধ সব হিন্দুই মেনে নিতেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে যেখানে মিতাক্ষরা চলে সেখানে কোথাও

কোথাও অন্য মতও আছে। যেমন অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগুদের মধ্যে ভাইয়ের ছেলে মেয়ের সঙ্গে বোনের মেয়ে বা ছেলের বহু জায়গায় বৈধ বিবাহ হয়। হিন্দু শাস্ত্রকার বৌধায়ন এটা মেনে নিয়েছিলেন। রেড্ডিদের মধ্যে প্রায়ই মামা ভাগ্নীতে বিয়ে হয়। আবার আর দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে শুধু সম্বন্ধ থাকলেই বিয়ে আটকায় না। যেমন, কোন পুরুষ যদি তাঁর স্ত্রীর ভগিনীর মেয়েকে বিবাহ করেন, তাহলে তা সিদ্ধ হবে।

সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ ঃ পুরান হিন্দু আইনে মেয়ে আর ছেলে এক গোত্র বা এক প্রবর হলে বিয়ে করতে পারতো না। নতুন আইনে সে বাধা তুলে দেওয়া হয়েছে, পরে আমরা দেখাব।

বিবাহ অনুষ্ঠান ঃ হিন্দু বিবাহে আচার রীতি যার যা কিছু হোক প্রত্যেক হিন্দু বিবাহে দুটি অনুষ্ঠান নিশ্চয় পালন করতে হত।

(১) পবিত্র অগ্নির সামনে প্রার্থনা ও যজ্ঞ। একে হোমাগ্নি বা হোমের আগুন বলা যেতে পারে।

(২) বর কনেকে নিয়ে একসঙ্গে হোমাগ্নির সামনে সপ্তপদ গমন করবে বা সাত বার পা ফেলে চলবে।

এই দুইটি অনুষ্ঠান হিন্দু বিবাহে নিশ্চয়ই করতে হত এবং দুইটি অনুষ্ঠান না হলে বিবাহ সম্পন্ন হত না। লোকাচার বা দেশাচার যা আছে তা ইচ্ছামত পালন করা যায়, কিন্তু হোমের আগুনের সামনে পূজা এবং বর কনের সপ্তপদ গমন না হলে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে একথা বলা চলতনা। বিবাহ নিয়ে যদি কখনও আদালতে কোন কথা ওঠান হত, তাহলে আদালত দেখতেন বিবাহের এই দুটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল কিনা ; এবং

তাহলে বিবাহ সম্পর্কে আর কোন কথা না শুনে বিবাহ সিদ্ধ হয়েছে এই মত মেনে নেওয়া হত। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সহবাস হয়নি, একথা বলে বিবাহকে কেউ অসিদ্ধ হয়েছে বলতে পারতেন না।

আবার দেশাচার ও লোকাচার মতে কোথাও কোথাও যদি ওপরের দুই অনুষ্ঠান পালন না করা হত, তাহলেও অন্য অনুষ্ঠানে হিন্দু বিবাহ করা চলত।

[হিন্দু আইন মতে বিধবা বিবাহে কোন অনুষ্ঠান না করলেও চলে। কারণ এ বিবাহ হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন (১৮৫৬) অনুসারে দেওয়া হয়।]

অন্য আইন ঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন ধর্মের যদি দুজন বা যে কোন দুই জন এক বা দুই ধর্ম পালন করেন এবং তাঁরা বিবাহ করতে চান তাহলে তাঁদের অন্য আইনের শরণ নিতে হত। তার নাম ছিল ১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহ আইন। সে আইন বদল করে নতুন আইন হয়েছে—১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইন। তার আলোচনা পরে হবে।

বিবাহের খরচা ঃ মিতক্ষরা মতে যৌথ সম্পত্তি থাকলে সেই যৌথ পরিবারের ছেলে বা মেয়ের বিবাহের জন্য ন্যায্য খরচা যৌথ পরিবারকে দিতে হত।

বিবাহের কর্তব্য ঃ আগের হিন্দু আইন মতে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী বাস করতে বাধ্য ছিলেন এবং তাঁকে স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নিতে হত। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আইনত ছাড়াছাড়ি হত না। আবার, স্বামী ও স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে বাধ্য ছিলেন এবং স্ত্রীকে পালন করার দায়ীত্বও স্বামীর ছিল।

আইনত নাবালিকা বিবাহিতা নারীর অভিভাবক হতেন তাঁর

স্বামী। স্ত্রীর বয়স যতই কম হোক তাঁর স্বামীর ঘর করতে হত। অবশ্য কোথাও কোথাও এমন প্রথা ছিল যে কন্যা ঋতুমতী হলে তবে স্বামীর ঘরে যেতেন। পুরাতন আইনে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর আত্মীয় স্বজন আগে তাঁর অভিভাবক হতেন, মেয়ের বাপের বাড়ীর স্থান পরে।

সহবাসের দাবী ঃ পুরাতন হিন্দু আইনে স্বামী ও স্ত্রী দুজনের এই অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে না থাকতে রাজী হতেন তাহলে স্বামী আদালতের আশ্রয় নিয়ে স্ত্রীকে নিজের কাছে আনতে পারতেন। কিন্তু আদালত যদি দেখেন যে স্বামী জঘন্য ব্যাধিতে ভুগছেন, বা বাড়ীতে রক্ষিতা রেখেছেন বা তিনি স্ত্রীর উপর এমন অত্যাচার করেন যে স্বামীর কাছে গেলে বিপদ হতে পারে, বা স্বামী হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম নিয়েছেন তাহলে আদালত সব বিচার বিবেচনা করে স্বামীর সহবাসের দাবী নাচক করে দিতে পারতেন। কিন্তু আগেকার আইনে যেহেতু স্বামী বহু বিবাহ করতে পারতেন, সেই হেতু স্বামী আবার বিবাহ করলে আগেকার স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে আপত্তি করতে পারতেন না। স্ত্রী নাবালিকা হলেও স্বামীর ঘরে যেতে তিনি অরাজী হতে পারতেন না।

আগেকার আইনে স্ত্রী নিষ্ঠুরতার অভিযোগ না করলেও স্বামী সোজাসুজি সহবাসের অধিকার পেতে পারতেন না। স্ত্রী যদি অভিযোগ করতেন যে স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেছেন বা অবহেলা করেন আর স্বামীর মামলার মধ্যে অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহলে আদালত স্ত্রীকে সুযোগ দিতেন, যাতে তিনি সাক্ষী ইত্যাদি দিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করতে

পারেন। আদালত তখন বিচার করে দেখতেন স্বামীর সহবাসের অধিকার দেওয়া উচিত হবে কিনা, এবং যদি দেওয়া যায় তাহলে কোন সর্ত আরোপ করা দরকার হবে কিনা।

বিবাহ বিচ্ছেদ : আগেকার হিন্দু আইন মতে বিবাহ বিচ্ছেদ একেবারেই করা চলতনা। স্বামী বা স্ত্রী কেউই ইচ্ছা করলে বা কোন কারণ ঘটলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারতেন না। তখন হিন্দু বিবাহকে মনে করা হত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন যা কখনই ভাঙতে পারেনা। স্বামী যদি পরস্ত্রীতে আসক্ত হন বা স্ত্রীও যদি পরপুরুষে আসক্ত হন বা দুশ্চরিত্রা হন বা কুলটা হন, তাহলেও স্বামী বা স্ত্রী কেউই বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করতে পারতেন না। সামান্য কয়েক জায়গায় দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের মধ্যে অবশ্য তাদের প্রথা অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারত। কিন্তু সাধারণত হিন্দু স্বামী বা স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার ছিল না। সেটা পরে এসেছে।

কিন্তু যদি কেউ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে চলে যেতেন আর তার জন্য স্ত্রী যদি স্বামীর কাছে যেতে অস্বীকার করতেন বা স্বামীকে ত্যাগ করতেন তাহলে স্বামী আদালতে অন্য আইন অনুযায়ী এক আবেদন জারী করতে পারতেন, এবং আদালত ইচ্ছা করলে সেই বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিতে পারতেন; আর স্বামী নতুন ধর্মে গিয়ে আবার নতুন বউ ঘরে আনতে পারতেন। তার মানে এই নয় যে ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে গেলে তখনকার দিনে বিয়ে আপনি ভেঙে যেত। ধর্ম ছেড়ে বিয়ে ভাঙতে হলে অনেক কারণ থাকা দরকার হত, এবং আদালতের আশ্রয় নিতে হত।

হিন্দু বিবাহ আইন

[১৯৫৫ সালের ২৫ নং আইন]

হিন্দুদের বিবাহ নিয়ে ১৯৫৫ সালের আগে একটা আলাদা কোন আইন ছিলনা। এই আলাদা আইন করার এক ইতিহাস আছে। মোটামুটি আমরা দু'চার কথায় সেই ইতিহাস এখানে জানাব। পাঁচবার গোটা হিন্দু আইনকে একটা বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় আনার চেষ্টা হয়েছে। সাধারণত হিন্দুরা তাদের শাস্ত্র, রীতি নীতি, বংশ পরম্পরার ধারা মেনে চলতেন। হিন্দু শাস্ত্র ইত্যাদি মতে কাজ হচ্ছে কিনা তা শাস্ত্র-জানা পণ্ডিতেরা বলতেন, তাঁরা রায় দিতেন। ১৮৩৩ সালে একবার ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের এবং মুসলমানদের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে হিন্দু আইন ও মুসলিম আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য কমিশন বসিয়ে ছিলেন। সেটা সফল না হলে ১৮৫৩ সালে দ্বিতীয় বার এবং ১৮৬১ সালে তৃতীয় বার ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের অধীনস্থ ভারত-সচিব চেষ্টা করেন। তারপর চতুর্থ বার ১৯২১ সালে দিল্লীর বড়লাট বিলেতের ভারত-সচিবের মত নিয়ে একটা কমিটি বসান। কমিটি বলেন হিন্দু আইনের কোন কোন জায়গায় বিধিবদ্ধ করা যায়, সব জায়গায় নয়; সুতরাং তাঁরা সে চেষ্টা ছেড়ে দেন। হিন্দু আইনের পণ্ডিত হরি সিং গৌর দিল্লীর তখনকার আইন সভায় হিন্দু আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য প্রস্তাব দেন, কিন্তু তখনকার সরকার রাজী হন না। তারপর দেশ স্বাধীন হলে দিল্লীর আইন সভায় (তখনও পার্লামেণ্ট গড়া হয়নি) ১৯৪৭ সালে 'রাও কমিটির' হিন্দু আইন বিল দাখিল

করা হয়। সেই বিল বিবেচনার জন্য ৯ই এপ্রিল ১৯৪৮ সালে আইন সভার বিশেষ কমিটির কাছে যায়। কমিটি চার মাস পরে রিপোর্ট দেন। নতুন পার্লামেণ্টে এই আইন নিয়ে ১৯৫২ সালে আলোচনা হয়। আলোচনা চলার সময় স্বাধীন ভারতের সরকারের আদেশ পরামর্শ অনুযায়ী হিন্দুদের জন্য সব বিষয়ে একটা আইন না করে আলাদা আলাদা আইন গঠন করার রায় দেওয়া হয়। প্রথমে পার্লামেণ্টে যখন ১৯৫২ সালে বিলটি ওঠে তখন বিলের নাম ছিল হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল। পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ কথাটি বাদ দেওয়া হয় এবং ১৮ই মে ১৯৫৫ তারিখে ভারতের রাষ্ট্রপতি এই আইনে সম্মতি দেন। সেদিন থেকে এই আইন বলবৎ হয়েছে। হিন্দুদের জন্য নানা বিষয়ে যে সব আইন হয়েছে, হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫) তার মধ্যে প্রথম।

কারা এই আইনের আওতায় পড়বেন ঃ ভারতবর্ষের জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া সব অঞ্চলে হিন্দুদের ওপর এই আইন বলবৎ হবে। যাদের এই আইনের মধ্যে আনা হয়েছে তাদের বর্ণনা এই আইনে দেওয়া আছে। সমস্ত নতুন হিন্দু আইন যা ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে পাশ হয়েছে তাদের বর্ণনা মোটামুটি একই রকম। এই বইতে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের কথাও এই হিন্দু বিবাহ আইনে বলা আছে। সুতরাং পুরো তালিকা আর দেওয়া হল না। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ও শিখ ধর্মের লোকেরা এই আইনের আওতায় পড়ছেন। আর ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ বা আর্য সমাজের লোকদের বা লিঙ্গায়েত বা বীর শৈব ব্যক্তিদের হিন্দু ধর্মেই ধরা হয়েছে।

সকলেরই বৈধ বা অবৈধ সন্তানদেরও এই আইনে আনা হয়েছে।

পুরানো আইন সব বাতিল ঃ এই আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে এই আইন বলবৎ হবার ঠিক আগে হিন্দু আইন সম্পর্কে যদি অন্য কিছু বলা হয়ে থাকে তা সব বাতিল হয়ে গেল। শাস্ত্রে বা আইনের ব্যাখ্যায় বা রীতিনীতিতে এই নতুন আইনের বিষয়গুলির বিপরীত কিছু থাকলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

আর এই আইনের বিপরীত যদি কোন আইন আগে থেকে থাকে তাহলে সে আইন আর বলবৎ থাকবে না।

হিন্দু বিবাহে সর্ত ঃ হিন্দু বিবাহ সম্পর্কে পূর্বেকার আইনে কি কি বিধি ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। নতুন এই আইনে যে সর্ত দেওয়া হল তা ৫নং ধারায় আছে। সেগুলি হল ঃ

(ক) বিবাহের সময় বরের অন্য কোন স্ত্রী বা কনের অন্য কোন স্বামী জীবিত অবস্থায় থাকবে না।

(আগের আইনে পুরুষের স্ত্রী থাকতে আবার তিনি বিয়ে করতে পারতেন, এখন থেকে আর নয়। মেয়েদেরও একসঙ্গে দুই স্বামী পূর্ব আইনে ছিল না, এখনও থাকবেনা।)

(খ) বিবাহের সময় বর বা কনে যেন বোধশূন্য বা উন্মাদ না হয়।

(আগের আইনেও এটা নিষিদ্ধ ছিল। তাহলেও পাগলের বিয়ে হবার পর ছেলেপুলে হলে সে বিবাহ আইনে মেনে নেওয়া হত)।

(গ) বিয়ের সময় বর যেন ১৮ বছর পার হয় আর কনে ১৫ বছর।

(আগে সারদা আইনে কনের বয়স ১৪ বছরের ওপর হওয়ার দরকার ছিল।)

(ঘ) বর ও কনে যেন নিষিদ্ধ সম্বন্ধের মধ্যে না পড়েন ; অবশ্য তাদের দেশাচারে ও লোকাচারে যদি সেরকম বিবাহ চালু থাকে তাহলে তা মেনে নেওয়া হবে।

নিষিদ্ধ সম্বন্ধ বলতে বলা হচ্ছে বর আর কনের মধ্যে যদি নীচে লেখা কোন সম্বন্ধের যোগ থাকে তাহলে তা নিষিদ্ধ বলে ধরতে হবে।

(১) দুজনের মধ্যে একজন যদি একই বংশধারায় সম্বন্ধে আগে পরে থাকেন।

(২) একজন যদি একই বংশের আগেকার বা পরেকার ধারায় অন্য কারও স্বামী বা স্ত্রী থেকে থাকেন।

(৩) কনে যদি আগে বরের কয়েকটি ধারার নিকট আত্মীয়ের বধূ থাকেন তাহলে বিবাহ হবে না। আত্মীয়গুলি হচ্ছেন—বরের ভাই, বা জেঠা খুড়ো, বা মামা, বা ঠাকুরদার ভাই বা ঠাকুরমার ভাই।

(৪) দুজনে যদি ভাই বোন হয়, খুড়া ভাইঝি বা মামা ভাগ্নী হন, বা খুড়ী আর দেওর পো কি ভাসুর পো হন, বা মামী ভাগ্নে হন, বা ভাই ও বোনের ছেলে মেয়ে বা মেয়ে আর ছেলে হন বা দুই ভাই-এর বা দুই বোনের ছেলে মেয়ে হন তখন বিয়ে হবে না।

(দুজনের নিকট রক্ত-সম্বন্ধ হলে বিবাহ হবে না আগে দেখান হল। ভাই বলতে বোঝাবে সহোদর ভাই বা বৈমাত্রে ভাই, বা এক মাতৃগর্ভ ও ভিন্ন স্বামীর ঔরসজাত ভাই। নিকট রক্ত সম্বন্ধের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ সম্বন্ধ দুই ধরা হবে। যেমন

পিতার রক্ষিতার কন্যা অবৈধ সন্তান হলেও তার সঙ্গে পিতার বৈধ স্ত্রীর পুত্রের কোনমতে বিবাহ হবে না। নিকট রক্তের সম্বন্ধের সঙ্গে দত্তক পুত্রের কন্যার সম্বন্ধও ধরা হবে।)

(ঙ) বর বা কনে উভয়ে যেন সপিণ্ড সম্বন্ধের মধ্যে না পড়েন। অবশ্য যেখানে উভয়ের দেশাচার ও লোকাচার অনুযায়ী এ রকম বিবাহ চালু আছে সেটা মেনে নেওয়া হবে।

সপিণ্ড সম্বন্ধ হচ্ছে মাতার দিক থেকে তিন পূর্বপুরুষ, আর পিতার দিক থেকে পাঁচ পূর্বপুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ ; সেই সম্বন্ধের মধ্যে যদি বর ও কনের উভয়ের পূর্ব পুরুষের সম্বন্ধ পাওয়া যায় তাহলে বিবাহ হবে না। এখানে প্রথম পুরুষ নিজেকে অর্থাৎ বর বা কনেকে ধরতে হবে।

"দুজন পরস্পরের সপিণ্ড" এ কথার মানে হচ্ছে ছেলে ও মেয়ে উপরে লেখা সপিণ্ড সম্বন্ধের যে কোন পূর্বপুরুষ হতে সম্বন্ধযুক্ত।

সপিণ্ড সম্বন্ধ বা উভয়ে সপিণ্ড হলে বিয়ে হবে না। এখানে বলা দরকার এই ব্যাপারে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ দুই মতকে এক করা হল।

(চ) যেখানে কনের বয়স আঠার পার হয়নি, সেখানে কনের কোন অভিভাবক থাকলে তাঁর অনুমতি নিতে হবে।

(বর্তমান আইনে যে বাধা নিষেধগুলি বলা আছে তাতে স-গোত্র বা অসবর্ণ বিবাহের কথা বলা নেই। অর্থাৎ নতুন আইনে এই বাধা নিষেধগুলি লোপ পেল। তার ফলে হিন্দু বিবাহে বর কনে স-গোত্র হলে বা অসবর্ণ হলে আইনত সিদ্ধ হবে আর তাকে হিন্দু বিবাহ বলেই মেনে নেওয়া হবে।

কাহারা কনের অভিভাবক হতে পারেন :

(ক) যেখানে নাবালিকা কনের অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন তাঁদের তালিকা নীচে দেওয়া হল। নম্বর হিসাবে অগ্রাধিকার হবে। এই আইনের ৬(১) ধারায় এই তালিকা আছে।

১। পিতা

২। মাতা

৩। পিতামহ

৪। পিতামহী

৫। সহোদর ভাই—বড় তাই হলে ভাল হয়।

৬। বৈমাত্র ভাই—বড় হলে ভাল হয়। অবশ্য তিনি যদি কনেকে লালন পালন করে থাকেন এবং মেয়ে তাঁর সংসারে বাস করে।

৭। পিতার সহোদর ভাই—তাঁদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি হলে ভাল।

৮। পিতার বৈমাত্র ভাই; জ্যেষ্ঠ হলে ভাল, অবশ্য যদি কনে এঁর সংসারে প্রতিপালিত হন এবং সংসারে বাস করেন।

৯। মাতামহ

১০। মাতামহী

১১। মাতার সহোদর ভাই—তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলে ভাল হয়। অবশ্য মেয়েকে যদি তিনি প্রতিপালন করে থাকেন এবং নিজ সংসারে রাখেন।

(খ) ৬(২) ধারায় বলা হচ্ছে ২১ বছর বয়স না হলে কেউ বিয়েতে অভিভাবক বা অভিভাবিকার স্থান নিতে পারবেন না।

(গ) ওপরের তালিকা অনুযায়ী যিনি অভিভাবক হবার যোগ্য তিনি যদি বিয়েতে অভিভাবকের স্থান নিতে রাজী না হন, বা অপারগ হন, বা শারীরিক অসুস্থ থাকেন, তাহলে তালিকায়

তাঁর পরে যাঁর পরিচয় আছে বিয়েতে তিনি অভিভাবক হবেন।

(ঘ) যদি ওপরের তালিকা অনুযায়ী কোন অভিভাবক না থাকেন তাহলে এই আইন অনুযায়ী বিবাহের জন্য অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন হবেনা।

[আগের হিন্দু বিবাহে অভিভাবকের কন্যাদান একটা উপদেশ ছিল। তা না হলেও আদালত বিয়ে মেনে নিয়েছিলেন। এখানে আইন করে বলা হল অভিভাবক কেউ না থেকে থাকলে বিয়ে আটকাবে না।

এখানে অভিভাবকদের মধ্যে মাতার স্থান খুব উঁচুতে দেওয়া হয়েছে—পিতার ঠিক পরেই। আগে ছিল সব চেয়ে নীচে।

এখানে ৬(৫) ধারায় বলা হচ্ছে আদালত কনের স্বার্থে মনে করতে পারেন যে সেই বিয়েতে কনের অভিভাককের অনুমতি দরকার। তাহলে আদালত অদেশ দিয়ে বিয়ে স্থগিত রাখতে পারেন এবং অভিভাবকের অনুমতি সংগ্রহ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

বিবাহের অনুষ্ঠান ঃ এই আইনের ৭নং ধারায় বলা হচ্ছে

(১) বর বা কনের প্রচলিত দেশাচার ও লোকাচার অনুযায়ী বিবাহের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

(২) যেখানে এই আচার বা রীতির মধ্যে পবিত্র হোমাগ্নির সামনে বর-কনেকে সপ্তপদ বা সাতবার পা ফেলে যেতে হয়, সেখানে সপ্তম পা পড়া হলেই বিবাহ সম্পূর্ণ এবং বিবাহ-বন্ধন শুরু হল।

[আগেকার আইনে হোমাগ্নি পূজা ও যজ্ঞ এবং সপ্তপদী গমন বিয়েতে নিশ্চয় পালন করতে হত। এখন সেখানে দেশাচারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।]

কিন্তু হোমাগ্নির সামনে সপ্তপদ গমন হিন্দু বিবাহে সাধারণত পালন করতে হয়। সপ্তপদীর সাতটা পা হোমাগ্নির সামনে ফেলা পূর্ণ হলেই বিয়ে হয়েছে ধরতে হবে।

অবশ্য আগের মত এখনও বৈষ্ণবদের কণ্ঠীবদল করে বিয়ে করাকে আইনে মেনে নেওয়া হচ্ছে। বৈষ্ণবরা হোমাগ্নি জ্বালেন না। আবার আদিবাসী সাঁওতাল ছেলে মেয়ের মাথায় সিঁদুর দিলেই বিবাহ হয়েছে ধরা হবে। এখানে দেশাচার ও লোকাচার মেনে নেওয়া হচ্ছে। এখানে হোমাগ্নির সামনে সপ্তপদ গমন দরকার পড়ছে না। কিন্তু তাহলেও আইনত বিবাহ সিদ্ধ হচ্ছে।

হিন্দু বিবাহঃ রেজেস্ট্রীকরণ

অন্য অন্য নানা বিবাহের মত হিন্দু বিবাহ কখনও রেজেষ্ট্রী করতে হত না। আমাদের দেশে অনেক হিন্দু তিন আইনে (১৮৭২ সালের তিন নম্বর আইন) বিবাহ করতেন। সেগুলি হয় অসবর্ণ বিবাহ বা ব্রাহ্ম বিবাহ। সেই আইনে বিবাহ করলে তাকে হিন্দু বিবাহ বলা হত না। আর সেই আইনে বিবাহ করলে উত্তরাধিকারীদের হিন্দুদের নিয়ম বা আইন অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগ হত না। সেখানে সম্পত্তি ভাগ হত ভারতীয় উত্তরাধিকারী আইনে, হিন্দু উত্তরাধিকারী আইনে নয়। ১৮৭২ আলের তিন আইনও বদল হয়েছে। সে কথা আমরা পরে বলব।

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের ৮নং ধারায় বলা হচ্ছে যে "হিন্দু বিবাহ আইন"মতে বিবাহ হলেও বিবাহ রেজেষ্ট্রী করা যাবে। এর একটা কারণ হচ্ছে বহু হিন্দু স্বামী স্ত্রী যখন বিদেশে যান তখন তাঁদের বিবাহের প্রমাণ দেখাতে হয়। আগে হিন্দুদের বিবাহে কোন সার্টিফিকেট দেওয়া হত না। বিদেশে বিবাহের সার্টিফিকেট না দেখালে হিন্দু স্বামী-স্ত্রীকে তাঁরা বিবাহিত কিনা তা বিদেশীরা ঠিক করতে পারতেন না। আবার বিবাহের সার্টিফিকেট থাকলে ভবিষ্যতে আদালতে এ বিষয় কোন মামলা উঠলে সেটা প্রমাণ হিসাবে দেখান যাবে। সেই সব অসুবিধা দুর করার জন্য এই আইনে ব্যবস্থা হয়েছে ; হিন্দু বিবাহ হলে বিবাহ রেজেষ্ট্রী করা যাবে এবং তার সার্টিফিকেটও পাওয়া যাবে।

এই আইনের ৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে হিন্দু বিবাহের প্রমাণ রাখার সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার তার যথাযথ ব্যবস্থা করবেন এবং হিন্দু বিবাহ রেজিষ্টার রাখবেন। হিন্দু বিবাহ রেজেষ্ট্রী করা বিষয়ে রাজ্য সরকার নিয়ম কানুন ঠিক করবেন আর সে সব নিয়ম কানুন রাজ্যবিধান সভায় পেশ করতে হবে। কোন রাজ্য সরকার মনে করলে হিন্দু বিবাহ রেজেষ্ট্রীকরণ বাধ্যতামূলক করতে পারেন। তার মানে হিন্দু বিবাহ রেজেষ্ট্রী করতেই হবে, এ নিয়ম চালু করতে পারেন। আর রেজেষ্ট্রী না করলে ২৫·০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। তবে সব রাজ্য সরকার এ রকম ব্যবস্থা করেন নি।

আইনে অবশ্য এ কথা বলা হয়েছে যে কেউ যদি হিন্দু বিবাহ রেজেষ্ট্রী না করেন বা করতে ভুলে যান, তার জন্য তাঁর হিন্দু বিবাহে কোন দাগ পড়বেনা। কারণ, যেখানে সপ্তপদ গমন হলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়েছে আইনে বলা আছে, সেখানে সামান্য রেজেষ্ট্রী না করার ক্রুটির জন্য বিবাহ বিষয়ে কিছু ক্রুটি ধরা হয়না। অন্য যেখানে রাজ্য সরকার রেজেষ্ট্রী করাটা বাধ্য করেন সেখানে রেজেষ্ট্রী করাই ভাল। এর খরচাও খুব কম।

সহবাসের দাবী : স্বামী বা স্ত্রী যোগ্য কারণ ছাড়া যদি ইচ্ছা করে ছাড়াছাড়ী বাস করেন, তাহলে কি হবে? যে কোন পক্ষ তখন সহবাসের দাবী করতে পারেন। আর সেই দাবী আদালতে পেশ করতে পারেন। আদালতও যদি দেখেন দরখাস্তের বয়ান সত্য এবং দুজনে ছাড়াছাড়ি বাস করার আইনগত কোন যোগ্য কারণ নেই, তাহলে তিনি দরখাস্তকারীকে বা দরখাস্তকারিণীকে এই অধিকার দিতে পারেন। অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর মিলন করিয়ে দিতে পারেন।

এখনে স্ত্রীকেও অধিকার দেওয়া হয়েছে; তিনিও স্বামী আলাদা থাকলে সহবাসের দাবী করতে পারেন। আগে এই অধিকার স্ত্রীকে দেওয়া হতনা।

স্ত্রীর আলাদা বাসা ও খোরপোষ: এই সঙ্গে অন্য আর একটা আইনের কথা বলে রাখা দরকার। ১৯৫৬ সালের ৭৮ নং আইন অনুযায়ী স্ত্রী যথাযোগ্য কারণ দেখিয়ে স্বামীর কাছ হতে সরে গিয়ে আলাদা বাস করতে পারেন। আবার স্ত্রী আলাদা বাস করে খোরপোষও আদায় করতে পারেন। এই আইনের নাম ১৯৫৬ সালের হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইন। এই আইন সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করব।

আইনত স্বতন্ত্র:

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন চালু হবার আগে বা পরে যাঁদের বিবাহ হয়েছে তাঁরা স্বতন্ত্র বা আলাদা থাকার দরখাস্ত করতে পারেন। এই আইনের ১০ নং ধারায় বলা হয়েছে কোন কোন কারণে এই আলাদা থাকার দরখাস্ত করা যায়।

(ক) দরখাস্ত করার দিন থেকে অন্তত দু বছর ধরে বরাবর অপর পক্ষ (স্বামী বা স্ত্রী) দরখাস্ত-কারিনী বা দরখাস্ত-কারীকে ত্যাগ করেছেন।

(খ) অপর পক্ষ এমন নিষ্ঠুর আচরণ করেন যে তাঁর সঙ্গে থাকলে ক্ষতি ও গভীর আঘাত পেতে হবে।

(গ) দরখাস্ত করার দিন থেকে অন্তত এক বৎসর আগে হতে অপরপক্ষ সাঙ্ঘাতিক কুষ্ঠ রোগে ভুগছেন।

(ঘ) দরখাস্ত দাখিল করার অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্ব হতে দরখাস্তর দিন পর্যন্ত অপর পক্ষ গরমি (গোগন) ব্যাধিতে

ভুগছেন আর সে ব্যাধি অপরকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এই ব্যাধি দরখাস্তকারিনীর বা দরখাস্তকারীর কাছ হতে অপর পক্ষের কাছে যায়নি।

(ঙ) দরখাস্ত দেবার অন্তত দু বছর আগে থেকে অপর পক্ষ বিকৃত মস্তিস্ক (মাথা খারাপ) রোগে ভুগছেন।

(চ) বিবাহ সম্পন্ন হবার পর অপর পক্ষ পরস্ত্রী বা পর-পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেছেন।

আদালত সব দিক বিবেচনা করে স্বামী স্ত্রীকে আলাদা আলাদা বাস করার রায় দিতে পারেন। আদালতের রায়ের পর সহবাস অধিকারের দাবী করা যাবে না। যে কোন পক্ষ আবার তখনই বিবাহও করতে পারবেন না। যদি এর পর বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তাহলে একটা সময় পার হবার পর তবে যে কেউ আবার অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেন। সে বিষয় পরে বলব।

আদালতের এই রায়ের পর দু জন আলাদা থাকার অনুমতি পাবেন। কিন্তু তারপর দু পক্ষের যে কেউ আদালতে আবার দরখাস্ত করতে পারেন যে তাঁরা আবার স্বামী স্ত্রী রূপে বাস করতে চান। আদালত সব দিক বিচার করে যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে আগেকার রায় খারিজ করে দিতে পারেন এবং স্বামী স্ত্রীর মিলন আবার ঘটিয়ে দিতে পারেন।

[বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে আদালত এরকম মিলন ঘটাতে পারেন না।]

বিবাহ নাকচ :

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন চালু হবার আগে বা পরে বিবাহ হলে যদি দেখা যায় বিবাহে কতকগুলি আইন-বিরোধী

কাজ হয়েছে তাহলে সেই বিবাহ অবৈধ হয়েছে ঘোষণা করে নাকচ হয়ে যাবে। এখনে আইন বিরোধী কাজগুলির মধ্যে ১১ ধারায় বলা হচ্ছে বিবাহের সময় পাত্র বা পাত্রীর যদি অন্য স্ত্রী বা স্বামী থাকে, অথবা নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বা সপিণ্ড সম্বন্ধে বিবাহ হয়েছে তাহলে সেই বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হয়ে যাবে, এবং নাকচ হবে।

আবার ১২ নং ধারায় বলা হয়েছে কোন কোন কারণে বিবাহ নাকচ করে দেওয়া যেতে পারে। সেগুলি হল—

(ক) স্বামী বিবাহের সময় থেকে দরখাস্ত করার দিন পর্যন্ত নপুংসক ছিলেন।

(খ) স্বামী বা স্ত্রী বিবাহের সময় বোধশূন্য বা উন্মাদ ছিলেন।

(গ) বল প্রয়োগ বা প্রবঞ্চনা করে অপর পক্ষ বিবাহের সম্মতি আদয় করেছেন ; বা যে অভিভাবকের সম্মতি দরকার সেখানে বল প্রয়োগ বা প্রবঞ্চনা করেছেন।

(ঘ) বিবাহের সময় স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং তার কারণ অন্য কোন পুরুষ, স্বামী নন।

বিবাহ নাকচ করবার দরখাস্ত পেশ করার কতকগুলি নিয়ম আছে সেগুলি হল—

(১) বল প্রয়োগ করার ঘটনার এক বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করতে হবে বা প্রবঞ্চনা ধরা পড়ার পর এক বৎসরের মধ্যে।

(২) বল প্রয়োগ করার ঘটনাব পর এবং প্রবঞ্চনা হয়েছে জানার পরও যদি উভয়ে পূর্ণ সম্মতিতে স্বামী স্ত্রী হিসাবে বাস করেন তাহলে দরখাস্ত করা চলবে না।

আবার স্ত্রী বিবাহের সময় অপর পুরুষের সঙ্গে বিবাহের আগে মিলনের ফলে গর্ভবতী ছিলেন এই কারণে বিবাহ নাকচ করতে হলে তিনটি সর্ত চাই। সেগুলি হল—

(১) বিবাহের সময় স্বামী এ ঘটনা জানতেন না।

(২) ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন চালু হবার আগে যদি বিবাহ হয়, তাহলে এই আইন চালু হবার এক বছরের মধ্যে দরখাস্ত করতে হবে। আর, এই আইন চালু হবার পর যদি বিবাহ হয় তাহলে বিবাহের তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে দরখাস্ত করতে হবে।

(৩) এই ঘটনা জানার পর স্বামী নিজের ইচ্ছায় স্ত্রীর সঙ্গে আর সহবাস করেন নি।

[বিবাহের আগে অপর পুরুষের দ্বারা স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছিলেন কিনা তার প্রমাণও দিতে হবে। কারণ, অনেক সময় স্বামী স্ত্রী বিবাহের পূর্বেও উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে সহবাস করতে পারেন এবং তার ফলে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হবে জেনে সম্মতি দিয়ে স্ত্রী গর্ভবতী হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে এই কারণে বিবাহ নাকচ হবার সম্ভাবনা নেই।]

এই আইনের ১১ ও ১২ ধারা মতে যদি বিবাহ নাকচ হয় ও নাকচ হবার আগে দুজনের মিলনে যদি পুত্র কন্যা জন্ম নেয় ও জীবিত থাকে তাহলে এই আইনের ১৬ ধারা মতে সেই সব পুত্র কন্যাদের বৈধ হলে ধরা হবে। বিবাহ নাকচ হবার ফলে পুত্র কন্যারা অবৈধ হয়ে যাবে না। অবশ্য এই সব পুত্র কন্যারা অন্য বৈধ পুত্র কন্যাদের মত হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬) অনুযায়ী সম্পত্তির ভাগীদার হবে না। তারা শুধু তাদের জন্মদাতা পিতা ও মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী থাকবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন চালু হওয়ার আগে বা পরে বিবাহ হলে, স্বামী বা স্ত্রী তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাবার ডিক্রী পাবার দরখাস্ত আদালতে পেশ করতে পারেন। দরখাস্তের কারণ হিসাবে যা যা বলা যেতে পারে তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল। কারণগুলির মধ্যে যে কোন একটি বা তার বেশী যুক্তি বিবেচনা করা হবে। ১৩ নং ধারায় এগুলি বলা হয়েছে।

(১) স্বামী বা স্ত্রী পরস্ত্রী বা পর-পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে আসছেন।

(২) অপরপক্ষ অন্য ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু ধর্ম হতে সরে গেছেন।

(৩) অন্তত তিন বছর আগে থেকে দরখাস্ত দেবার দিন পর্যন্ত অপর পক্ষ বিকৃত মস্তিস্কে ভুগেছেন আর সে রোগ সারান যায় না।

(৪) অন্তত তিন বছর আগে থেকে দরখাস্ত দেবার দিন পর্যন্ত অপরপক্ষ এমন এক কুষ্ঠ রোগে ভুগছেন যা সাঙ্ঘাতিক এবং সারান যায় না।

(৫) অন্তত তিন বছর আগে থেকে দরখাস্ত দেবার দিন পর্যন্ত অপর পক্ষ এমন এক গরমি রোগে (গোপন রোগে) ভুগছেন যার থেকে দরখাস্তকারী বা দরখাস্তকারিণী সেই রোগে পড়তে পারেন।

(৬) কোনও ধার্মিক কারণে অপর পক্ষ সংসার চিরকালের জন্য ত্যাগ করেছেন।

(৭) দরখাস্ত করার দিন থেকে অন্ততঃ সাত বছর ধরে অপর পক্ষের সঙ্গে দেখা হয়নি, এবং তিনি জীবিত থাকলে জীবিত আছেন কিনা তা তাঁর আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কেউ জানেন না।

(৮) আইনত বিচ্ছিন্ন থাকার ডিক্রী পাবার পর দুবছর বা তার বেশী সময়ের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সহবাস হয়নি।

(৯) সহবাসের অধিকারের দাবী আদালত মঞ্জুর করার পর দুবছরের মধ্যে বা তার বেশী সময়ের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মিলন ও সহবাস হয়নি।

এই আইনের ১৩(২) ধারা মতে স্ত্রীও কয়েকটি বিশেষ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত পেশ করতে পারেন ; সে দুটি কারণ হল ঃ

(১) ১৯৫৫ সালের হিন্দু আইন চালু হবার আগে যদি বিবাহ হয়, এবং স্বামী সেই বিবাহের পরে এবং এই আইন চালু হবার আগেই আবার বিবাহ করেন, তাহলে সেই কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত পেশ করা যেতে পারে। আবার এই আইন চালু হবার পর বিবাহ হলে স্ত্রী যদি দেখেন স্বামী এই আইনের পূর্বে বিবাহ করেছিলেন এবং সেই স্ত্রী বেঁচে আছেন তাহলেও স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত আদালতে পেশ করতে পারেন।

দরখাস্তে স্বামীর আর একটা বিবাহ হয়েছিল শুধু এই কথা বললে চলবে না, অন্য বিবাহিতা স্ত্রী বর্তমান থাকা চাই।

(২) দ্বিতীয় কারণ হল বিবাহ সম্পন্ন হবার পর স্বামী বলাৎকারের দোষে অভিযুক্ত বা কোন পাশবিক অত্যাচার করেছেন।

বিবাহ বিচ্ছেদ দরখাস্ত পেশ করার সময়ঃ এই আইনের ১৪ ধারা মতে বলা হয়েছে বিবাহ সম্পন্ন হবার পর তিন বছর পার না হলে স্বামী বা স্ত্রী কেহই বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত পেশ করতে পারবেন না। অবশ্য আদালত যদি মনে করেন যে একজনের উপর ভীরণ অত্যাচার হচ্ছে বা অপর পক্ষ অতি নীচ জীবন যাপন করছেন তাহলে ঐসব কারণে দরখাস্ত বিবাহের তিন বছর পার হবার আগেই দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু এই সব কারণ প্রমাণ করতে হবে।

১৪(২) ধারায় বলা হচ্ছে তিন বছরের আগে দরখাস্ত গ্রহণ করার আগে আদালত বিবাহের পর ছেলে মেয়ে যারা জন্মেছে তাদের স্বার্থ বিবেচনা করে দেখবেন। রায় দেবার আগে এটারও বিচার করবেন যে বিবাহের তিন বছর পার হবার আগেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এখন মিলনের সম্ভাবনা আছে কি না।

বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দেবার আগে আদালত সব কিছু বিচার করে দেখবেন এবং দেখবেন যাতে বিবাহ বিচ্ছেদ সহজে না হয়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন হয়। এই আইনের ২৩(২) ধারায় বলা আছে স্বামী স্ত্রীর যে কোন বিবাদের মামলা শোনার আগে তাঁদের মধ্যে মিলন ঘটানর সব রকমের চেষ্টা করা আদালতের প্রথম কর্তব্য হবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর অন্য বিবাহঃ বিবাহ-বিচ্ছেদ (ডিভোর্স) হবার পর এই আইনের ১৫ ধারা মতে স্বামী বা স্ত্রী একটা সময় পার হবার পর আবার অন্য বিবাহ করতে পারেন। বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় দেবার পর যদি উচ্চ আদালতে আপীল করা হয় তাহলে সেই আপীলের রায় বার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা

করতে হবে। অবশ্য আপীল করার একটা সময় দেওয়া আছে। অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় বার হবার পর একটা সময়ের মধ্যে আপীল করতে হবে। অবশ্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষে প্রথম রায় বার হবার পর এক বছর পার না হলে স্বামী বা স্ত্রী কেউই আবার অন্য বিবাহ করতে পারবেন না।

পুত্র কন্যাদের লালন পালনঃ স্বামী স্ত্রীর যে কোন বিরোধের মামলা চলাকালীন তাঁদের নাবালক পুত্র কন্যাদের সুরক্ষণ, লালন-পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য দরখাস্ত পেশ করা যেতে পারে। আদালত সম্ভব হলে পুত্র কন্যাদের কি ইচ্ছা জেনে নিতে পারেন, কিন্তু তাদের রক্ষা করা, লালন-পালন করা ও শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে সে সব বিষয়ে আদালত যা উচিত ও যোগ্য মনে করবেন সেই রকম রায় দেবেন। স্বামী স্ত্রীর বিরোধের মামলার রায় দেবার সময় আদালত পুত্র কন্যাদের জন্য এই বিষয়ে রায় দেবেন। দরকার হলে মামলা চলার সময়েও পুত্রকন্যা সম্বন্ধে আদালত এ রকম নির্দেশ দিতে পারেন। আদালত যদি মনে করেন তাহলে সময় সময় পুত্র কন্যা সম্বন্ধে রায় নাকচ করতে পারেন, স্থগিত রাখতে বা সর্ত বদল করে দিতে পারেন। এই আইনের ২৬ ধারায় এ বিষয়ে বলা আছে।

মামলার খরচা ও খোরপোষঃ মামলা চলাকালীন মামলার খরচা বা খোরপোষ দেবার বিধি এই আইনের ২৪ ধারায় দেওয়া আছে। স্ত্রী বা স্বামী এ বিষয়ে দরখাস্ত করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে কারও যদি নিজের এমন যথেষ্ট কোন উপার্জন না থাকে তাহলে এই আবেদন করা যাবে। আদালত

তখন দুজনের আয় ও অবস্থা বিবেচনা করে মামলা চলার সময় অপর পক্ষকে (স্বামীকে বা স্ত্রীকে) আদেশ দিতে পারেন, যেন তিনি মামলার খরচা তাঁর স্ত্রীকে বা স্বামীকে দেন আর মাসে মাসে ন্যায্য মাসোহারা দেন।

[স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে বিবাদ হলে মামলার সময় অর্থাভাবে একজন যাতে অসহায় না হয়ে পড়েন তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।]

স্ত্রী বা স্বামীর জন্য এককালীন দান বা স্থায়ী খোরপোষ ঃ এই আইনের ২৫ ধারা মতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ হলে আদালত ডিক্রি (রায়) দেবার সময় খোরপোষ ও এককালীন নগদ টাকা দেবার আদেশ দিতে পারেন। স্ত্রী যদি মামলা রুজু করেন এবং মামলায় জিতে যান তাহলে প্রতিবাদী স্বামীকে এই নগদ টাকা বা খোরপোষ দিতে হবে। অপর পক্ষে স্বামী যদি স্ত্রীর দোষ দেখিয়ে মামলা দাখিল করেন এবং মামলায় জিতে যান তাহলে স্ত্রীকে সেই রকমভাবে নগদ টাকা বা মাসিক খোরপোস দিতে হবে। মামলা চলবার সময় এই খোরপোষের বা নগদ টাকার দাবী যদি না করা হয়, তাহলে মামলা জেতার পরও যে কোনও সময়ে আদালতে আবেদন করা যাবে। আদালত উভয় পক্ষের উপার্জন ও সম্পত্তির হিসেব বুঝে এবং উভয়ের ব্যবহার বিবেচনা করে যা ন্যায্য মনে করবেন সেই রকমভাবে নগদ টাকা দিতে বা মাসিক খোরপোষ বা উভয়ই দিতে আদেশ দেবেন। মাসিক বা অন্য খোরপোষ আবেদনকারীর জীবিতকাল পর্যন্ত দিতে হবে। এই টাকা আদায়ের জন্য অপর পক্ষের স্থাবর সম্পত্তির ওপরও চাপ পড়তে পারে।

এই রায় দেবার পর আদালত যে কোন সময়ে যদি দেখেন যে কোন একজনের অবস্থা বদলে গিয়েছে, তাহলে আদালত যা ন্যায্য মনে করবেন সেইভাবে আগের রায় কিছু বদল করতে পারেন বা একেবারে রদ করে দিতে পারেন।

এই খোরপোষের ব্যবস্থা আদালত কয়েকটি কারণে একেবারে নাকচ করে দিতে পারেন। কারণগুলি হল ঃ যিনি খোরপোষ পান তিনি যদি আবার বিবাহ করেন, অথবা তিনি স্ত্রী হলে শুদ্ধ থাকেননি অর্থাৎ পরপুরুষের আসক্ত হয়েছেন; আর স্বামী হলে অন্য মেয়ের সঙ্গে সহবাস করেছেন।

খোরপোষ বা নগদ টাকার দাবী কয়েক জায়গায় করা চলবে না। যেমন, যেখানে বিবাহ অবৈধ প্রমাণ হয়েছে। আর যেখানে মামলা চলার সময় খোরপোষ বা নগদ টাকার দাবী করলেও আদালত তা অগ্রাহ্য করেছেন। সুতরাং নতুন করে আবার দাবী করা চলবে না। খোরপোষের দাবী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হয়। বিবাহ অবৈধ ঘোষণা হলে উভয়ে আর স্বামী স্ত্রী থাকছেন না। সেখানে খোরপোয়ের দাবী টেঁকে না। তবে আইনত স্বতন্ত্র থাকলে এই দাবী করা চলে।

আবার, বিবাহ বিচ্ছেদের পর বা আইনত স্বতন্ত্র থাকার সময় স্ত্রী যদি পিত্রালয়ে থাকেন তাহলেও স্বামী খোরপোষ বন্ধ করতে পারবেন না। স্ত্রীর যদি নিজের স্বাধীন কোন উপার্জন থাকে তাহলে সেটা বিবেচনা করা হবে। তবে খোরপোষ-এর মধ্যে স্ত্রীর লেখাপড়া করার খরচ ধরা হয় না। এতে শুধু ভরণ পোষণের কথা ভাবা হয়।

এখানে দেখা যাচ্ছে শুধু স্ত্রী নন, স্বামীও খোরপোষ পেতে পারেন। তবে স্বামীর নিজের উপার্জনে খাবার সামর্থ্য আছে

কিনা, আর স্ত্রীর খোরপোষ দেবার ক্ষমতা আছে কিনা—এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করে দেখতে হবে।

বিচারের শুনানীতে গোপনতা ঃ হিন্দু বিবাহ আইনে কোন মামলা উঠলে কোন এক পক্ষ যদি চান, তাহলে মামলার শুনানী গোপনে হবে। আদালত নিজেই যদি মনে করেন গোপনে শুনানী হওয়া দরকার তাহলে আদালতই গোপন শুনানীর আদেশ দিতে পারেন। আর আদালতের অনুমতি ছাড়া মামলার শুনানীর বিষয় ছাপান বা প্রকাশ করা আইন-বিরুদ্ধ হবে। কেউ যদি এই আইন ভঙ্গ করেন তাহলে তাঁর এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। এই আইনের ২২ ধারায় এ বিষয় বলা হয়েছে।

স্ত্রী জীবিত থাকতে বিবাহে শাস্তি ঃ ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন চালু হবার পর কোনও পুরুষ তাঁর স্ত্রী বর্তমান থাকতে যদি আবার বিবাহ করেন তাহলে সে বিবাহ অবৈধ হবে, এবং তাতে তাঁর কঠোর শাস্তি হবে। শাস্তিতে সাত বছর পর্যন্ত জেল ভোগ আর জরিমানাও হবে। আর আগেকার বিয়ে গোপন করলে জেলের মেয়াদ দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে, জরিমানাও হবে। এটা মেয়েদের বেলায়ও খাটবে। অর্থাৎ কোন বিবাহিতা স্ত্রী স্বামী জীবিত থাকতে আর একজন পুরুষকে বিবাহ করলে এই সাজাই পাবেন।

হিন্দু বিবাহের অন্য সর্ত ভঙ্গে শাস্তি ঃ হিন্দু বিবাহে অন্য কয়েকটি সর্ত ভঙ্গ করে বিবাহ হলেও শাস্তি পেতে হবে। সর্তগুলি হল—

(ক) বিয়ের সময় বরের বয়স যদি ১৮ বছরের কম হয় বা কনের বয়স যদি ১৫ বছরের কম হয়।

(খ) বর ও কনের মধ্যে সে সময় যদি বিবাহ নিষিদ্ধ সম্বন্ধ থাকে।

(গ) বর ও কনে যদি সে সময় সপিণ্ড সম্বন্ধের হয়।

(ঘ) বিবাহের সময় যদি কনের বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তার অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুমতি না নেওয়া হয়।

কি কি শাস্তি হবে :

(১) উপরের (ক)-এর সর্ত ভঙ্গ হলে ১৫ দিন পর্যন্ত জেল বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা দুই রকমই সাজা।

(২) ওপরের (খ)-এর বা (গ)-এর সর্ত ভঙ্গ করলে এক মাস পর্যন্ত জেল বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা দুই রকমই সাজা।

(৩) ওপরের (ঘ)-এর সর্ত ভঙ্গ করলে শুধু এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে।

এই সব শাস্তির ব্যবস্থা এই আইনের ১৭ ও ১৮-ধারায় বলা হয়েছে। তবে কোন কোন সর্ত ভঙ্গ হলে বিবাহ অবৈধ বা নাকচ হবে, সে বিষয় আমরা আগে এই আইনের ১১ ধারা ও ১২ ধারা আলোচনার সময় বলেছি। অর্থাৎ "বিবাহ নাকচ" এই বিষয় আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে। ওপরের (ক) ও (ঘ) সর্ত ভঙ্গ করলে বিবাহ নাকচ বা অবৈধ হয় না। অর্থাৎ কম বয়সের ছেলে বা কম বয়সের মেয়ের বিয়ে হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও বিবাহ ভাঙবে না। আবার নাবালক মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করলে শাস্তি হলেও বিয়ে ভাঙবে না।

নতুন আইনে মেয়েদের সুবিধা : ১৯৫৫ সালের নতুন হিন্দু বিবাহ আইনে মেয়েদের অনেকগুলি সুবিধা দেওয়া

হয়েছে। প্রথম হচ্ছে মেয়েদের আর সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হবে না। তার মানে স্বামী ইচ্ছা করলেই স্ত্রী বর্তমান থাকতে আগের মত আর একটা বিয়ে করে নতুন বৌ ঘরে তুলতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, অসবর্ণ বিবাহ এই আইনে মেনে নেওয়া হল। সাবালক মেয়েরা ইচ্ছা করলে যে কোন বর্ণের হিন্দু ছেলেকে হিন্দু-বিবাহ আইন মতে বিবাহ করতে পারবেন। বামুনের মেয়ে কায়েতের ছেলেকে বা কায়েতের মেয়ে বামুনের ছেলেকে স্বচ্ছন্দে হিন্দু-বিবাহ করতে পারবেন। বামুন, কায়েত, বদ্দি, শূদ্দুর বলে হিন্দু বিয়েতে কোন ভেদ আর রইল না। শুধু তাই নয়, পাত্র ও পাত্রীর একই গোত্র হলেও হিন্দু-বিবাহ হবে। ঘোষে-ঘোষে, বাঁড়ুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে বা ঐ রকম এক গোত্র দুজনের হলে হিন্দু-বিবাহ আটকাবে না।

মেয়েদের আর দুটো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হল। যোগ্য কারণ দেখিয়ে হিন্দু স্ত্রী স্বামী থেকে স্বতন্ত্র থাকতে পারেন ও তার জন্য খোরপোষ পাবেন। শুধু তাই নয়; আগে স্বামী দুটো দশটা বউ ঘরে রেখে আর একজন বউকে দাসী বাঁদীর মত রাখতেন, সে উপায় আর রইল না। এখানে মেয়েদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হল। এখন মেয়েরা যথেষ্ট কারণ থাকলে বিয়ে ভেঙে দিতে পারবেন, এবং ইচ্ছা করলে আবার বিয়ে করে নতুন স্বামীর ঘর করতে পারবেন। আগে বিয়ের বাঁধনটা শুধু মেয়েদের ওপর খাটত। আগে হিন্দু মেয়েদের একবার বিয়ে হলে তা আর কোনমতেই ভাঙত না। শত অত্যাচারে স্বামীর ঘর করতে হত। অথচ স্বামী ইচ্ছা করলে আবার বিয়ে করতে পারতেন। সে রাস্তা এখন বন্ধ হল। মেয়েদেরও জোর বাড়ল।

নতুন আইনে মেয়েদের অধিকারও বাড়ল। মেয়ের অভিভাবক হিসাবে আগেকার আইনে মায়ের স্থান ছিল সবচেয়ে নীচে। আর এই নতুন আইনে মেয়ের অভিভাবক হিসেবে মাতার স্থান হল পিতার ঠিক পরে। মেয়ের মাকে আগে এই সম্মান দেওয়া হয়নি; এই নতুন আইনে দেওয়া হল।

অনেকের মতে নতুন হিন্দু-বিবাহ আইন (১৯৫৫) আগেকার হিন্দু-বিবাহ আইনকে অনেক পালটিয়ে দিয়েছে। নানা দিক দিয়ে বিচার করলে সত্যিই এই নতুন আইনে মেয়েদের বহু অধিকার দেওয়া হয়েছে যা আগেকার আইনে ছিল না।

বিশেষ বিবাহ আইন

(১৯৫৪ সালের ৪৩ নং আইন)

হিন্দু বিবাহে পাত্র পাত্রীর পূর্ব পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে অনেক বিচার করে দেখতে হয়। পাত্র এবং পাত্রীর দুজনেরই পিতৃপুরুষের উপরের পাঁচ ধাপ ও মাতৃপুরুষের তিন ধাপ বিচার করে দেখা হয়, দুপক্ষের পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা। সেই সম্বন্ধ থাকলে 'হিন্দু-বিবাহ আইন' মতে বিবাহ করা যায় না। সপিণ্ড সম্বন্ধ হলেও বিবাহ করা যায় না। তাছাড়া অন্যান্য নিকট সম্বন্ধেও ঐ আইন মতে বিবাহ করার বাধা আছে। তাই আগে এই বাধা এড়িয়ে যাবার জন্য অনেক হিন্দু ছেলেমেয়ে অন্য আর এক আইনে বিয়ে করত। সে আইনের নাম হ'ল ১৮৭২ সালের ৩ আইন। অনেকে সেই বিবাহকে রেজিষ্টারী বিবাহ আইন বলতেন। যাই হোক স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সরকার যখন হিন্দু আইনের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন, তখন এই তিন আইন নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। হিন্দুদের জন্য যেমন নানা বিষয়ে আইন বদল করে নতুন আইন করলেন, তখন তাঁরা এই ৩ আইনের বিবাহ আইন বদল করে এক নতুন বিবাহ আইন করলেন। ১৯৫৫ সালে, হিন্দু-বিবাহ আইন চালু হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে, ১৮৭২ সালের ৩ নং বিবাহ আইন বদল করে, সরকার এক নতুন বিবাহ আইন পাশ করলেন। তার নাম হল বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ (স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৪)। এই আইন ১৯৫৪ সালের ৯ অক্টোবর বিধিগতভাবে ছাপান

হলেও এটা চালু হয় ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫৫ সাল হিন্দু-বিবাহ আইন, আর বিশেষ বিবাহ আইন, দুটোই একই বছরে চালু করা হলো। একই বছরে এই দুই বিবাহ আইন চালু করার ফলে বুঝতে হবে, অনেক জায়গায় এই দুই আইনে মিল আছে। সামান্য কয়েক জায়গায় তফাৎ আছে। আমরা এই দুই বিবাহ আইনে কোথায় কোথায় বিশেষ তফাৎ আছে, সেগুলি বলব। সামান্য তফাতের কথা তুলে লাভ নেই।

(১) হিন্দু-বিবাহ আইনে পাত্রের বয়স ১৮ পূর্ণ হওয়া চাই, আর পাত্রীব বয়স ১৫ হওয়া চাই। বিশেষ বিবাহ আইনে পাত্রের বয়স ২১ পূর্ণ হওয়া চাই আর পাত্রীর ১৮ বৎসর।

(২) পাত্র পাত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে বিশেষ আইনে কোথায় বাধা আছে, তার দুটি দীর্ঘ তালিকা এই আইনে দেওয়া আছে, সেই তালিকা আমরা পরে দিচ্ছি।

(৩) হিন্দু বিবাহে হোমাগ্নির সামনে সপ্তপদ গমন নিশ্চয়ই করতে হবে, এই বিবাহের আগে রেজেষ্ট্রি করতে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু বিশেষ বিবাহ আইনে বিবাহ করতে হলে নাম ধাম পরিচয় দিয়ে রেজিষ্ট্রি অফিসে একমাস আগে নোটিশ দিতে হয়। সেই নোটিশ প্রকাশ্যে টাঙান হয় এবং কোন আপত্তি না থাকলে এক মাস পরে বিবাহ অধিকর্তার কাছে অন্যান্য সাক্ষীর সামনে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ হবার পর দম্পতীকে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সেইটেই বিবাহের প্রমাণ।

(৪) বিশেষ বিবাহ আইনের বিবাহে স্বামী স্ত্রীর একটা সর্ত পালন করা চাই। সেটা হল বিবাহের পরে তাদের দুজনের সহবাস। এই সহবাস না হলে সেই কারণ দেখিয়ে, বিবাহ

নাকচ করে দেওয়া যায়। হিন্দু-বিবাহে এ রকম কোন সর্ত নেই।

(৫) বিশেষ বিবাহ আইনে, বিবাহ বিচ্ছেদের অনেকগুলি যুক্তি দেখান যায়। তার মধ্যে একটির কথা এখানে বলা হচ্ছে। সেটি হ'ল সাত বছরের জেল। যদি ভারতীয় সাজা আইনের ধারায় (ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড্) সাত বছরের জেল হয়, তাহলে জেল হবার তিন বছর পর স্বামী বা স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারেন। হিন্দু-বিবাহ আইনে এই ব্যবস্থা নেই।

(৬) হিন্দু-বিবাহ আইন ও বিশেষ বিবাহ আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য অনেকগুলি কারণ প্রায় একই রকমের। কিন্তু বিশেষ বিবাহ আইনে একভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায়—সেটা বিশেষ-বিবাহ আইনে করা যায় না বিশেষ বিবাহ আইনে দু'জনে মিলেমিশে বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত একসঙ্গে পেশ করতে পারেন। তাঁদের শুধু দুটি কারণ দেখাতে হয়। সে দুটি কারণ হলো—

(ক) তাঁরা এক বছর বা তার ওপরে একসঙ্গে বাস করছেন না।

(খ) আর তাঁরা মনে করছেন, যেহেতু তাঁরা একসঙ্গে বাস করতে পারবেন না, সেই হেতু, তাঁরা দুজনেই বিবাহ বিচ্ছেদ করতে রাজী হয়েছেন। এই রকম দরখাস্তে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য অন্য কোন কারণ দেখাতে হয় না। এই দরখাস্ত দাখিল করার এক বছর পরে কিন্তু দুবছরের মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলে আগের দরখাস্ত অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য আদালতকে অনুরোধ করতে পারেন। আদালত সব দিক

বিবেচনা করে স্বামী স্ত্রীর মিলিত দরখাস্তের বলে, বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল বলে ঘোষণা করতে পারেন।

[স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম ঝগড়া বিবাদ না করে নিজেদের কেলেঙ্কারী আদালতে না উঠিয়ে এখানে সহজে আর সম্মানের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করার সুবিধা আইনে দেওয়া হয়েছে। এরকম ব্যবস্থা হিন্দু বিবাহ আইনে নেই।]

(৭) আইনত স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকলে বা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে খোরপোষ বা এককালীন টাকা দেবার ব্যবস্থা আছে। হিন্দু বিবাহ আইনে এই টাকা বা খোরপোষ স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ পেতে পারেন। 'বিশেষ বিবাহ আইনে' কিন্তু শুধু স্ত্রীর জন্যই ভরণ পোষণ (খোরপোষ) বা এককালীন টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিশেষ বিবাহ আইনে, স্বামী এ সব কিছু পান না। তবে স্বামী অন্য ক্ষতিপূরণ পান। সেটা হচ্ছে স্ত্রী যদি পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস করেন, তাহলে স্বামী মামলা করে সেই পরপুরুষের কাছ হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারেন।

কোন হিন্দু 'বিশেষ বিবাহ আইনে' বিবাহ করলে, দুটি বেশ অসুবিধায় পড়বেন। সে দুটি হলো—

১। তাঁকে আর সেই পরিবারভুক্ত বলে গণ্য করা হবে না। এখানে হিন্দু বলতে, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের সকলকে বোঝায়।

২। বিশেষ বিবাহ আইনে বিবাহ হলে, স্বামী স্ত্রী ও তাঁদের সন্তান সন্ততিরা 'ভারতীয় উত্তরাধিকার' আইন (১৯২৫)-এর অধীনে যাবেন। তাঁরা আর ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অধীনে থাকবেন না।

১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইনে নিষিদ্ধ সম্বন্ধ তালিকা ঃ

যে যে সম্বন্ধ থাকলে বিশেষ বিবাহ আইনে (১৯৫৪) বিবাহ করা যায় না তাদের তালিকা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ পাত্রের ক্ষেত্রে বোঝাবে, এবং দ্বিতীয় ভাগ পাত্রীর ক্ষেত্রে বোঝাবে। অর্থাৎ প্রথম ভাগের তালিকার সম্বন্ধ হচ্ছে পাত্রের সঙ্গে, আর দ্বিতীয় ভাগের তালিকার সম্বন্ধ হচ্ছে পাত্রীর সঙ্গে। সম্বন্ধগুলি যেখানে দেখান হয়েছে সেখানে একটি বিষয় বুঝতে হবে। যেমন ভাই বা ভগিনী বলতে তিন রকমের ভাই বা ভগিনী বোঝায়। (১) একই পিতার ঔরসে ও একই মাতার গর্ভজাত ভাই বা ভগিনী। (২) একই পিতার ঔরসে কিন্তু বিমাতার গর্ভে জাত ভাই বা ভগিনী। (৩) একই মাতার গর্ভে কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরসে জাত ভাই বা ভগিনী। আবার রক্ত সম্বন্ধে বৈধ ও অবৈধ দুই সম্বন্ধই বুঝতে হবে এবং দত্তক সম্বন্ধ ও রক্ত সম্বন্ধ দুই বুঝতে হবে।

[এই তালিকা আলাদা অপর পাতায় দেওয়া হল]

১নং তালিকা (পাত্রর ক্ষেত্রে)

১। মাতা
২। বিধবা বিমাতা
৩। বিধবা দিদিমা
৪। মার বিধবা বিমাতা
৫। দিদিমার বিধবা মাতা
৬। দিদিমার বিধবা বিমাতা
৭। দাদামহাশয়ের মাতা
৮। দাদামহাশয়ের বিধবা বিমাতা
৯। ঠাকুর মা
১০। বাবার বিমাতা
১১। বাবার দিদিমা
১২। ঠাকুরমার বিধবা-বিমাতা
১৩। বাবার ঠাকুর মা
১৪। ঠাকুরদার বিমাতা
১৫। কন্যা
১৬। বিধবা পুত্রবধূ
১৭। মেয়ের মেয়ে
১৮। মেয়ের বিধবা পুত্রবধূ
১৯। পুত্রের কন্যা
২০। ছেলের বিধবা পুত্রবধূ
২১। মেয়ের মেয়ের মেয়ে
২২। মেয়ের মেয়ের বিধবা পুত্রবধূ
২৩। মেয়ের ছেলের মেয়ে
২৪। মেয়ের ছেলের বিধবা পুত্রবধূ
২৫। ছেলের মেয়ের মেয়ে
২৬। ছেলের মেয়ের বিধবা পুত্রবধূ
২৭। ছেলের ছেলের মেয়ে
২৮। ছেলের ছেলের বিধবা পুত্রবধূ
২৯। ভগিনী
৩০। ভাগিনেয়ী
৩১। ভাইঝি
৩২। মাসীমা
৩৩। পিসীমা
৩৪। জেঠা খুড়োর মেয়ে (ভগিনী সম্পর্ক)
৩৫। পিসীর মেয়ে (ভগিনী সম্পর্ক)
৩৬। মাসতুতো ভগিনী
৩৭। মামাতো ভগিনী

[এখানে বিধবা অর্থে বিবাহ-বিচ্ছেদ কারিণী স্ত্রীও বোঝাবে। যেখানে বিধবা লেখা নেই সেখানে কুমারী না হ'লে বিধবা বুঝতে হবে ; কারণ সধবাকে বিবাহ করা যায় না।]

২নং তালিকা (পাত্রীর ক্ষেত্রে)

১। পিতা
২। সৎ-পিতা
৩। ঠাকুরদা
৪। বাবার সৎ-পিতা
৫। বাবার ঠাকুরদা
৬। ঠাকুরদার সৎ-পিতা
৭। ঠাকুরমার বাবা
৮। ঠাকুরমার সৎ-পিতা
৯। দাদামহাশয়
১০। মার সৎ-পিতা
১১। মার ঠাকুরদা
১২। দাদামহাশয়ের সৎ-পিতা
১৩। দিদিমার পিতা
১৪। দিদিমার সৎ-পিতা
১৫। পুত্র
১৬। নিজ জামাতা
১৭। পৌত্র
১৮। পুত্রের কন্যার স্বামী
১৯। কন্যার পুত্র
২০। মেয়ের মেয়ের স্বামী
২১। ছেলের ছেলের ছেলে
২২। ছেলের ছেলের নিজ জামাতা
২৩। ছেলের মেয়ের ছেলে
২৪। ছেলের মেয়ের নিজ জামাতা
২৫। মেয়ের ছেলের ছেলে
২৬। মেয়ের ছেলের নিজ জামাতা
২৭। মেয়ের মেয়ের ছেলে
২৮। মেয়ের মেয়ের নিজ জামাই
২৯। ভ্রাতা
৩০। ভাইপো
৩১। বোনপো
৩২। মামা
৩৩। জেঠা বা খুড়ো
৩৪। জেঠা বা খুড়োর ছেলে (ভাই সম্পর্ক)
৩৫। পিসীর ছেলে (ভাই সম্পর্ক)
৩৬। মাসীর ছেলে (ভাই সম্পর্ক)
৩৭। মামার ছেলে (ভাই সম্পর্ক)

[এখানে স্বামী বলতে বিবাহ-বিচ্ছেদকারী স্বামীকেও বোঝাবে।]

ভারতীয় উত্তরধিকার আইন, ১৯২৫

(১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন)

আমরা হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (পুরানো ও নতুন) সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করব। মুসলমানদের জন্য বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা আইন আছে। পরে তাঁদের বিষয় বলব।

ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (১৯২৫) ভারতের নাগরিকদের জন্য হয়েছে ; কিন্তু এই আইনে যাঁরা বাদ পড়বেন তাঁরা হলেন —হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ। বাকী সব লোক যাঁরা অন্য ধর্মে বিশ্বাস করেন এবং তাঁদের জন্য আলাদা উত্তরাধিকার আইন নেই তাঁরা মেনে চলবেন। আর এক দলও এই আইনের আওতায় পড়বেন। যেসব হিন্দুদের বিবাহ হিন্দু আইনে হয়নি, বিশেষ বিবাহ আইনে হ'য়েছে তারাও উত্তরাধিকার সম্পর্কে এই আইন মেনে চলবেন। যেমন কোন হিন্দু আগে যদি ১৮৭২ সালের তিন নং আইনে বা ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইনে বিবাহ করেন, তাহলে তাঁরা এবং তাঁদের বংশধররা এই আইনের মধ্যে থাকবেন।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঃ যেখানে উইল না করে কোন ব্যক্তি মারা গিয়েছেন তাঁর সম্পত্তি কিভাবে ভাগ বা বিলি হবে তার বিষয় এখানে বলা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কোন কোন ধর্মের লোকদের বাদ দেওয়া হয়েছে তার কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। এখানে যেসব নম্বর দেওয়া হ'ল সেগুলি এই আইনের ধারার নম্বর দেওয়া হয়েছে।

৩৩। (১) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর যদি তাঁর বিধবা পত্নী জীবিত থাকেন এবং যদি তাঁর পুত্র পৌত্র (ছেলে, নাতি, বা ছেলের নাতি) থাকেন তাহলে বিধবা পাবেন সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ। আর বাকী দুই ভাগ পাবেন তাঁর ছেলে নাতি পুতিরা। তাঁর মেয়ের নাতনী ও ছেলের নাতনী থাকলেও ঐ দুই ভাগ সমান অংশে পাবেন।

(২) তাঁর নিজের বংশধর যদি কেউ জীবিত না থাকেন শুধু অন্য নিকট জ্ঞাতি আত্মীয়রা থাকেন, তাহলে তাঁর বিধবা পত্নী সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন আর বাকী অর্ধেক সেই সব আত্মীয়রা সমানভাগে পাবেন।

(৩) আর তাঁর নিজের বংশধর বা আত্মীয় কেউ জীবিত না থাকেন, তাহলে তাঁর বিধবা পত্নী সম্পত্তির সব অংশ পাবেন।

[বিধবা পত্নী সম্পত্তির কত অংশে পূর্ণ অধিকার পাবেন আর কত অংশের ওপর বার্ষিক সুদ পাবেন তা ৩৩(ক) ধারায় লেখা আছে। আরও বলা হয়েছে ভারতীয় খৃষ্টান বা তাঁদের বংশধরেরা এর আওতায় আসবেন না।]

৩৪। মৃত্যুর সময় পত্নী জীবিত না থাকলে সম্পত্তি প্রথমে আপন বংশধরদের নিকট যাবে; আর তাঁরা কেউ না থাকলে জ্ঞাতি আত্মীয়রা পাবেন। আর এই তিন দলের মধ্যে কেউ যদি না জীবিত থাকেন তাহলে সম্পত্তি সরকারের হাতে যাবে।

৩৫। স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁর সম্পত্তিতে তাঁর বিধবা পত্নীর যে সব অধিকার হয়, স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামীও স্ত্রীর সম্পত্তিতে সেই রকম অধিকারগুলি পাবেন।

[বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে স্বামীর অংশ পাবার পর বাকী অংশ কিভাবে ভাগ হবে তা ৩৭ হ'তে ৪০ ধারায় বলা হয়েছে।]

(১) যদি শুধু ছেলেমেয়ে জীবিত থাকে, আর কোন নাতি পুতি (মৃত পুত্রের ছেলেমেয়ে) না থাকে তাহলে জীবিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমান ভাগ হবে।

(২) যদি কোন ছেলেমেয়ে না থাকে শুধু নাতি নাতনী আর মৃত কোন নাতি নাতনীর সন্ততি না থাকে তাহলে প্রাপ্য অংশের সবটা জীবিত নাতি নাতনীর মধ্যে সমান ভাগ হবে।

(৩) এই রকমভাবে মৃত ব্যক্তির নিজের বংশধরদের মধ্যে তাঁর কাছাকাছি সম্বন্ধে যাঁরা জীবিত থাকবেন তাঁরা সমান ভাগ পাবেন। এঁরা সম্বন্ধে নাতির ছেলেমেয়ে হতে পারেন বা অন্য দূর সম্পর্কে বা নিকটতম সম্বন্ধের হবেন।

(৪) মৃত ব্যক্তির নিজ বংশধর যদি কেউ না থাকেন বা নিকট জ্ঞাতি কেউ না থাকেন তাহলে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হবে।

কি রকম ভাবে সম্পত্তি ভাগ হ'বে নীচে উদাহরণ দিয়ে দেখান হচ্ছে।

(১) হরিবাবুর দুই ছেলে এক মেয়ে—রাম শ্যাম আর বাণী। হরিবাবুর আগে রাম চার ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেলেন ; বাণী এক সন্তান রেখে মারা গেলেন ; শুধু শ্যাম বেঁচে রইলেন। হরিবাবু মারা যাবার পর সম্পত্তি তিন ভাগ হল। এক ভাগ জীবিত পুত্র শ্যাম পেলেন ; আর এক সমানভাবে রামের চার ছেলেমেয়ের মধ্যে ভাগ হল আর তৃতীয় ভাগ বাণীর একমাত্র সন্তান পুরো পেলেন।

(২) মতিবাবু মারা যাবার সময় কোন ছেলেমেয়ে জীবিত ছিলেন না। কিন্তু ছেলে মেয়েদের আটজন নাতি নাতনী বেঁচে রইলেন আর মৃত নাতি বা নাতনীর দুই ছেলেমেয়ে রইলেন।

সম্পত্তিকে নয় ভাগ করা হল। এক এক ভাগ আটজন নাতি নাতনী পেলেন আর বাকী এক ভাগ নাতির দুইজন ছেলেমেয়ে পেলেন।

(৩) সতীশ বাবুর তিন ছেলেমেয়ে—যতীন জীতেন ও কমলা। সতীশ বাবুর আগে যতীন চার ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেলেন আর সতীশবাবুর আগেই যতীনের ছেলেদের মধ্যে এক ছেলে মারা গেলেন এবং দুটি সন্তান রেখে গেলেন ; কমলা একটি সন্তান রেখে মারা গেলেন। সতীশবাবু মারা যাবার পর সম্পত্তি তিনভাগ হল। এক ভাগ পেলেন জীবিত পুত্র জিতেন ; দ্বিতীয় ভাগ পেলেন কমলার সন্তান আর তৃতীয় ভাগ সম্পত্তিকে আবার চার ভাগ করা হল। এই চার ভাগের তিন ভাগ পেলেন যতীনের তিন ছেলেমেয়ে আর শেষ ভাগ আবার দু'ভাগ হয়ে যতীনের মৃত ছেলের ছেলেমেয়েদের দেওয়া হল।

(৪) আশুবাবুর মাত্র দুই সন্তান—শশী আব রাধা। আশুবাবুর আগে শশী মারা যাবার সময় তাঁর পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। আশুবাবু মারা যাবার সময় সন্তানদের মধ্যে রাধা বেঁচে রইলেন ; পরে সময় মত শশীর এক সন্তান জন্মাল। সম্পত্তি দুভাগ হয়ে এক ভাগ পাবেন রাধা আর এক ভাগ শশীর নবজাত সন্তান।

মালিকের যেখানে কোন বংশধর নেই, অর্থাৎ ছেলে মেয়ের দিক দিয়ে কেউ নেই তখন তাঁর বিধবা বেঁচে থাকলে সেই বিধবা পত্নীর প্রাপ্য অংশ দিয়ে বাকী অংশ কি ভাবে ভাগ হবে তা নীচে বলা হচ্ছে। ৪২ থেকে ৪৮ ধারায় এর বিবরণ দেওয়া আছে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী বেঁচে না থাকলে সব সম্পত্তিটা ভাগ হবে।

৪২। পিতা জীবিত থাকলে তিনি বাকী অংশ বা বিধবা পুত্রবধূ না থাকলে সবটা পাবেন।

৪৩। পিতা জীবিত না থাকলে যদি মা ও ভাইবোন জীবিত থাকেন আর অন্য কোন মৃত ভাই বোনদের সন্তান সন্ততি না থাকে তাহলে মা আর জীবিত ভাই বোনদের মধ্যে সমান ভাগ হবে।

৪৪। উদাহরণ: নগেন বাবু মারা যাবার সময় তাঁর মা বেঁচে রইলেন আর দুই ভাই খগেন ও বীরেন বেঁচে রইলেন। মীরা আগে মারা গিয়েছেন কিন্তু একটি ছেলে রেখে গিয়েছেন; আর এক ভাই ধীরেন আগে মারা গিয়ে দুটি ছেলে মেয়ে রেখে গিয়েছেন। ধীরেন কিন্তু নগেনের সহোদর ভাই নয়, সৎভাই। নগেন বাবু মারা যাবার পর মা ও সব ভাইবোন বেঁচে থাকলে মা ও চারজন ভাইবোন মিলে পাঁচজন থাকতেন। সম্পত্তি সেজন্য পাঁচটা সমান ভাগ হবে। পাঁচ ভাগের এক ভাগ মা পাবেন, আর এক ভাগ জীবিত দুই ভাই খগেন ও ধীরেন পাবেন, চতুর্থ ভাগ মীরার ছেলে পাবেন আর পঞ্চম ভাগ যেটা ধীরেনের প্রাপ্য ছিল সেটা তিনি বেঁচে না থাকাতে তাঁর দুই ছেলে মেয়ে সমান ভাগে পাবে।

৪৫। উদাহরণ: সুরেশ বাবু মারা যাবার সময় তাঁর বাবা বা ভাইবোন কেউ বেঁচে রইলেন না। শুধু থাকলেন মা আর মৃত ভাই ধীরেনের দুটি ছেলে ও মৃত বোন লীলার একটি ছেলে। সম্পত্তি ৪৪ নম্বরের মত ভাগ হবে। এখানে সমান তিন ভাগ হবে। এক ভাগ পাবেন মা, আর এক ভাগ পাবেন লীলার ছেলে আর শেষ ভাগ বীরেনের দুই ছেলে মেয়ের মধ্যে সমান ভাগে দেওয়া হবে।

৪৬। মালিকের মৃত্যুর সময় তাঁর পিতা বা ভাই ভগিনী কেউ জীবিত নেই, ভাই বোনদের কোন ছেলে মেয়েও নেই; শুধু মা বেঁচে আছেন। তাহলে বিধবা পত্নী না থাকলে মা সব পাবেন।

৪৭। মালিকের মৃত্যুর সময় বংশধরদের কেউ বা পিতা বা মাতা কেউ যদি জীবিত না থাকেন, তাহলে তাঁর জীবিত ভাই বোনদের মধ্যে এবং মৃত ভাই বোনদের মধ্যে তাঁদের ছেলে মেয়েরা যদি জীবিত থাকেন তাহলে সম্পত্তি ভাগ হবে এই ভাবে —সব ভাইবোন জীবিত থাকলে যতজন হতেন ততগুলি ভাগ হবে। অর্থাৎ পাঁচজন হলে সমান পাঁচ ভাগ; সাতজন হলে সমান সাত ভাগ। জীবিত ভাই বোনেরা সবাই ভাগের এক এক ভাগ পাবেন। আর মৃত ভাইবোনেদের ছেলে মেয়েরা তাদের বাবা বা মা বেঁচে থাকলে যে ভাগটা পেতেন সেই ভাগটা নিজেরা ভাগাভাগি করে নেবেন।

৪৮। স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন বংশধরদের কেউ বেঁচে না থাকলে নিকটতম ডিগ্রীর যারা বেঁচে থাকবেন তাঁরা সবাই সমান ভাগ পাবেন।

[কার কোন ডিক্রী তার একটা আলাদা চার্ট দেওয়া হল]
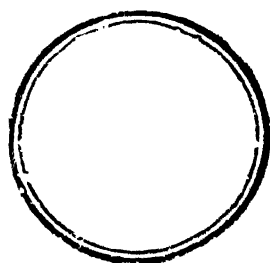
ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন

একই বংশের তালিকা

(সম্বন্ধের ডিগ্রি)
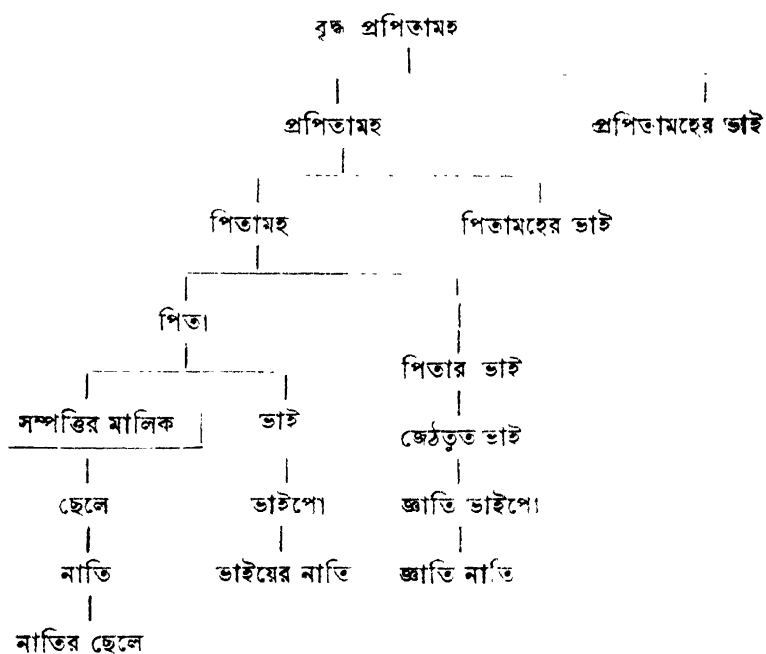
হিন্দু দত্তক এবং ভরণ-পোষণ আইন, ১৯৫৬

নিজের ছেলে মেয়ে না থাকলে দত্তক বা পোষ্যপুত্র বা কন্যা গ্রহণ করা হিন্দুদের অনেক দিনের প্রথা। আগেকার হিন্দু আইনে দত্তক সম্বন্ধে নানা রকমের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মেয়েদের অধিকার খুব কম ছিল। স্বাধীন ভারতে হিন্দুদের অন্য নানা বিষয়ের মধ্যে দত্তক সম্পর্কে আইনও ভালভাবে বিচার করে ১৯৫৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর এই আইনে সম্মতি দেওয়া হয়, আর ১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী হতে এই আইন চালু হয়। এই সঙ্গে ভরণ পোষণের ব্যবস্থাও আলাদা ভাবে যোড়া হয়। প্রথমে দত্তক সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে, পরে ভরণ-পোষণ সম্পর্কে।

দত্তক ব্যবস্থা ঃ

নতুন দত্তক আইনে বলা হল এই নতুন আইনে যে সব ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া এখন থেকে অন্য কোনভাবে দত্তক নেওয়া চলবেনা। তার মানে অন্যভাবে দত্তক নিলে আইনত মানা হবেনা। এই আইন শুধু হিন্দুদের জন্য। হিন্দু বলতে কাদের বোঝাবে আগেই আমরা অন্য জায়গায় বলেছি। আবার জানাচ্ছি। হিন্দু বলতে বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের লোকদেরও বোঝাবে। এখানে আবার পিতামাতা উভয়ে যেখানে হিন্দু সেখানে বৈধ ও অবৈধ সন্তান উভয়কে ধরা হয়েছে।

দত্তক নেবার ও দেবার ক্ষমতা ঃ কারা দত্তক নিতে পারবেন আর তাঁদের ছেলে মেয়েকে দত্তক দিতে পারবেন সে সম্পর্কে নতুন অধিকার অনেক দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে

মেয়েদের অধিকার এই আইনে বেশি দেওয়া হয়েছে। আগেকার সে অধিকার আইনে খুব কম ছিল। সব ক্ষেত্রে কয়েকটি ত্রুটি বাদ দিয়ে দত্তক নেবার বা দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ত্রুটিগুলি হল—বিকৃত মন, বা আদালত থেকে যাঁকে বিকৃত মস্তিস্ক বলা হয়েছে, যিনি সংসার ত্যাগ করেছেন (সন্ন্যাস নিয়েছেন) আর যিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছেন।

এই দত্তক আইন শুধু হিন্দুদের জন্য। ছেলে বা মেয়ে যাকে হোক দত্তক নেওয়া যায়।

(১) যে কোন পুরুষ দত্তক নিতে পারেন। তিনি বিবাহিত বা অবিবাহিত হতে পারেন। বিবাহিত হলে তাঁকে তাঁর স্ত্রীর সম্মতি নিতে হবে। একাধিক স্ত্রী থাকলে সব স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন। (আগেকার আইনে স্ত্রীর সম্মতি নেওয়া বাধ্যতা-মূলক ছিল না, এখানে তা করা হল।)

(২) যে কোন মহিলা দত্তক নিতে পারেন। অর্থাৎ নতুন আইনে অবিবাহিতা বা কুমারী মেয়েও দত্তক নিতে পারবেন। আর বিবাহিতা হলে স্বামী অবর্তমানে নিতে পারবেন। অর্থাৎ তিনি যদি বিধবা হন বা তাঁর যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং সে সময় আর বিবাহ না করেন। [আগে বিধবাদের দত্তক নেবার অধিকার ছিল; কিন্তু সেখানে দেখাতে হত যে, স্বামী জীবিত থাকতে মত দিয়েছিলেন। এখানে সে রকম সর্ত রইল না। বিধবার সন্তান না থাকলে নিজের ইচ্ছায় দত্তক নিতে পারবেন।]

দত্তক দেবার অধিকার ঃ কোন সন্তানকে দত্তক দিতে হলে শুধু তার পিতা বা মাতা বা বৈধ অভিভাবক দত্তক দিতে পারবেন। পিতা জীবিত থাকলে দত্তক দেবার অধিকার তাঁরই

সব চেয়ে আগে। কিন্তু দত্তক দিতে হলে মাতার সম্মতি ছাড়া দত্তক দেওয়া চলবে না। পিতা না থাকলে মাতার অধিকার থাকবে। পিতামাতা কেউ না থাকলে বৈধ অভিভাবক দত্তক দিতে পারবেন।

দত্তক নেবার সর্তঃ দত্তক নেবার কতকগুলি সর্ত আছে। পিতা বা মাতা এইসব সর্ত ও অবস্থা অনুযায়ী দত্তক নিতে পারবেন। এই সব সত ভঙ্গ করে দত্তক নেওয়া চলবে না। যিনি দত্তক নেবেন তাঁকে এই সব মানতে হবে। সর্তগুলি হলঃ

(১) কোন ছেলে পোষ্য নিলে তাঁর নিজের কোন ছেলে বা নাতি বা নাতির ছেলে জীবিত নেই। এখানে ছেলে মানে কোন দত্তক পুত্র বা তার বংশধরদেরও বোঝাবে।

(২) কোন মেয়ে পোষ্য নিলে নিজের মেয়ে বা ছেলের মেয়ে থাকবে না। (ছেলের মেয়ে অর্থে পোষ্য ছেলের মেয়েও বোঝাবে)।

(৩) যাকে দত্তক নেওয়া হবে সে হিন্দু এবং তার বয়স পনের বছরের নীচে, আর তাদের বিবাহ হয়নি। আর তাকে অপর কোন ব্যক্তি দত্তক নেননি।

(৪) পিতা যদি দত্তক কন্যা নেন তাহলে দুজনের বয়সের মধ্যে ২১ বছরের তফাৎ থাকবে। আর মা যদি দত্তক পুত্র নেন তাহলে দুজনের বয়সের মধ্যে ২১ বছর তফাৎ থাকবে।

(৫) দত্তক অর্পণ যথার্থ ভাবে হওয়া চাই। জন্মদাতা পিতা বা মাতা বা অভিভাবক স্ব-ইচ্ছায় তাঁর নিজের বংশ হতে অপর বংশে ছেলেকে বা মেয়েকে দত্তক দান করবেন।

দত্তক চিরস্থায়ীঃ দত্তক নেবার সময় হোম বা যজ্ঞ না করলেও তাকে বৈধ বলে ধরা হবে। বৈধভাবে দত্তক নেওয়া

হলে আর সেটা কখনও ভাঙা যাবে না। দত্তক পুত্র বা কন্যা আর পূর্ব পরিবারে ফিরে যেতে পারবে না।

দত্তক নেবার বা দেবার সময় উভয় দিক হতে কোন অর্থ বিনিময় বা অন্য কোন মূল্য দেওয়া নেওয়া চলবে না। সেটা আইন বিরুদ্ধ হবে এবং প্রয়োজন হলে সরকার শাস্তি দিতে পারবেন।

দত্তক পুত্র কন্যার অধিকার ঃ দত্তক পুত্র বা কন্যা নতুন যে পরিবারে আসবে সেই পরিবারের পুত্র বা কন্যার মত সব বিষয়ে সে অধিকার ভোগ করবে। আগে যে পরিবারে জন্ম নিয়েছিল সেই পরিবারের সঙ্গে আইনত সব সম্পর্ক ছিন্ন হবে এবং নতুন পরিবারে দত্তক নেবার দিন থেকে ছেলে বা মেয়ের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে। দত্তক পুত্র বা কন্যার পূর্ব পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলেও দুটি বিষয় মানতে হবে ঃ

(ক) পূর্ব পরিবারে থাকতে হিন্দু আইন মতে যাদের সঙ্গে বিবাহ করা যেতনা তাদের কারও সঙ্গে বিবাহ করা চলবে না।

(খ) দত্তক নেবার আগে পুত্র বা কন্যা পূর্ব পরিবারে থাকতে যদি কোন বিষয় সম্পত্তি পেয়ে থাকেন, তাহলে সে বিষয় তিনি ভোগ করতে পারবেন, কিন্তু তার দায় দায়ীত্বও তাঁকে মানতে হবে। আর দত্তক নেবার আগে পূর্ব পরিবারের অন্য কোনও ছেলে বা মেয়ে যদি বিষয়ের কোন অংশ দিয়ে থাকেন তাহলে তা নিয়ে তিনি আর কোন বলতে পারবেন না।

ভরণ পোষণের ব্যবস্থা ঃ এখানে হিন্দু বিবাহিতা মেয়েদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নাবালক ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী বা অপারগ বৃদ্ধ পিতামাতা তাঁদেরও ভরণ পোষণের আইনত ব্যবস্থা হয়েছে। হিন্দু বিবাহিতা মেয়েদের ভরণপোষণ স্বামীর কর্তব্য বলে আগেও

হিন্দু আইনে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আরও ভালভাবে আইন করে ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। বিবাহিতা স্ত্রীর বিয়ে এই নতুন আইন হবার আগে বা পরে যখনই হয়ে থাকুক তিনি এই আইনের সুযোগ পাবেন।

বিবাহিতা স্ত্রীর স্বতন্ত্র থাকা ঃ ১৯৪৬ সালে 'হিন্দু বিবাহিতা স্ত্রীর স্বতন্ত্র বাস ও ভরণ পোষণ আইনে' হিন্দু বিবাহিতা মেয়েকে কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই আইন চালু হবার পর সে আইন খারিজ হয়ে গেল। এখানে যে সব অধিকার দেওয়া হয়েছে তার জন্য হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬)-এর ৩০(২) ধারাটিও খারিজ করা হল। কোন কোন অবস্থায় হিন্দু স্ত্রী স্বতন্ত্র হতে পারবেন এবং স্বামীর কাছে ভরণ পোষণ দাবী করতে পারবেন তা নীচে বলা হচ্ছে।

(১) বিনা যোগ্য কারণে স্ত্রীর মত না নিয়ে এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন বা ইচ্ছা করে অবহেলা করছেন।

(২) স্বামী এমন নির্দয় ব্যবহার করেন যে স্ত্রীর মনে ভয় হতে পারে যে স্বামীর সঙ্গে বাস করলে বিপদ বা আঘাতের আশঙ্কা আছে।

(৩) স্বামীর যদি সাংঘাতিক কুষ্ঠ ব্যাধি হয়।

(৪) স্বামীর অন্য স্ত্রী যদি জীবিত থাকেন।

(৫) তিনি যদি বাড়ীতে বা অন্যত্র রক্ষিতা রাখেন।

(৬) স্বামী যদি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন।

(৭) অন্য কোন যথাযোগ্য কারণ যদি থাকে।

স্ত্রী যদি অসতী হয়ে যান বা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেন তাহলে এসব সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না।

হিন্দু বিধবার ভরণ পোষণঃ এই আইন চালু হবার আগে বা পরে যদি কোন মেয়ের বিবাহ হয় এবং তিনি স্বামীহারা হন তাহলে এই আইনে বিধবারা একটা সুবিধা আইনত পাবেন। বিধবার নিজের কোন আয় বা সম্পত্তি যদি না থাকে তাহলে তিনি শ্বশুরের কাছে ভরণ পোষণ দাবী করতে পারবেন। অবশ্য এও দেখতে হবে সেই বিধবা তাঁর স্বামী বা পিতা বা মাতার সম্পত্তি থেকে বা তাঁর ছেলেমেয়ে বা তাদের সম্পত্তি থেকে কোন ভরণ পোষণ পান কিনা। আর শ্বশুরের যৌথ সম্পত্তি থেকে ভরণ পোষণ দেবার মত শ্বশুরের সামর্থ্য না থাকলে বা বিধবা স্ত্রী আবার অন্য বিবাহ করলে শ্বশুরের কাছ থেকে ভরণ পোষণ পাবেন না।

ছেলে মেয়ে বাপ মার ভরণ পোষণঃ প্রত্যেক হিন্দু (পুরুষ বা স্ত্রী) তাঁর জীবিত কাল পর্যন্ত তাঁর নাবালক সন্তানকে এবং বৃদ্ধ অথর্ব পিতামাতাকে পালন করতে বাধ্য থাকবে। সন্তান অর্থাৎ ছেলেমেয়ে বৈধ বা অবৈধ হোক তারা নাবালক থাকলে তাদের লালন পালন করতে হবে। বৃদ্ধ পিতামাতা বা অবিবাহিতা কন্যা নিজের আয় বা সম্পত্তি থেকে যদি নিজের ভরণ পোষণ করতে না পারেন তাহলেই এই দায়িত্ব বর্তাবে। এখানে মাতা বলতে নিঃসন্তান বিমাতাকেও বোঝাবে।

সম্পত্তির ভাগ না পেলে অধীনস্থদের ভরণ পোষণঃ কোনও সম্পত্তি যদি মালিক উইল করে বিশেষ কাকেও দান করে থাকেন বা ওয়ারীশদের তালিকায় অন্য উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির ভাগ না পান তাহলে সেই মালিকের পরিবারে "অধীনস্থ" ব্যক্তিগণ ভরণ পোষণের অধিকার পাবেন। অধীনস্থ বলতে কারা নীচে তার বিবরণ দেওয়া হল। সম্পত্তি যারা

পেয়েছেন তাঁরা পুরুষ বা নারী যেই হোন তাঁদের সমান দায়িত্ব থাকবে।

(১) বাবা বা মা।

(২) বিধবা পত্নী (যদি পুনর্বিবাহ না হয়)।

(৩) নাবালক ছেলে, মৃত ছেলের ছেলে, মৃত নাতির ছেলে।

(৪) অবিবাহিতা থাকলে—মেয়ে, মৃত ছেলের মেয়ে, মৃত ছেলের মৃত ছেলের মেয়ে।

(৫) বিধবা কন্যা যদি তিনি স্বামীর সম্পত্তি থেকে বা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বা তাদের সম্পত্তি থেকে বা শ্বশুর বা বাবার কাছ থেকে বা তাদের সম্পত্তি থেকে যতদিন ভরণ পোষণ না পান।

(৬) বিধবা পুত্রবধূ, বা মৃত পুত্রের বিধবা পুত্রবধূ যতদিন আবার বিবাহ না করবেন বা অন্য জায়গা থেকে যদি ভরণ পোষণ না পান।

(৭) তাঁর অবৈধ পুত্র বা অবৈধ কন্যা যতদিন তারা সাবালক না হয়।

[এখানে মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যারা তাঁদের বাবার সম্পত্তি বা ঠাকুরদার সম্পত্তি থেকে যদি কিছু না পান। আর ছেলের বেলায় সাবালক হলে, আর মেয়ের বিবাহ হলে এই কারণেও এই আইনের বলে ভরণপোষণ পাবে না।]

ভরণ পোষণের মাপ ঃ কতটা ভরণ পোষণের যোগ্য বলে ধরা হবে সে বিষয়ে যদি বিবাদ হয়, তাহলে আদালত নানা দিক বিচার করে তা ঠিক করবেন। অবশ্য অবস্থার পরির্তন হলে সেই মাপও বদল হতে পারে।

এই আইনের ২৪ ধারায় বলা হয়েছে কেউ যদি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে এই আইনের বলে আর ভরণ পোষণ দাবী করতে পারবেন না।

মুসলমান মেয়েদের অধিকার

ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সব মেয়েরা আছেন, তাঁদের অধিকার নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো। অর্থাৎ মুসলমান মেয়েরা কতটা অধিকার ভোগ করেন, সেটাই মোটামুটি দেখান হবে। হিন্দুদের বেলায় আমরা আলোচনা করেছি, হিন্দু মেয়েদের অধিকার আগে কি ছিল এবং পরে কত বদল হয়েছে। এক এক জায়গায় হিন্দু আইন ঢেলে সাজান হয়েছে। এমন সব নতুন ব্যবস্থা হিন্দু আইনে আনা হয়েছে যা আগে কেউ ভাবতে পারতেন না। হিন্দু মেয়েদের এত বেশী অধিকার দেওয়া হয়েছে যা তাঁদের ঠাকুমা দিদিমারা চিন্তা করতে পারতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমান মেয়েদের বেলায় তাঁদের আইনে সে রকম কোন বড় রদবদল হয়নি। কেন হয়নি, তার কারণ আছে।

মুসলমান সমাজে একদল মনে করতেন মুসলমানদের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার বিবাহ বা সম্পত্তি সম্পর্কে কিছু বদল করার জন্য আইনের অদল বদল করা দরকার নেই। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি ছিলেন ডঃ হিদায়াতুল্লা। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অশেষ জ্ঞান। তিনি মুসলমানদের সামাজিক বা ব্যক্তিগত আইন অনেক জায়গায় বদল হোক তা চান। কিন্তু পৃথিবীর নানাদেশে এ নিয়ে কত মতবিরোধ হয়েছে তা তিনি লিখেছেন এবং বলেছেন সমস্ত ইসলামী আইনকে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা কোথাও সফল হয়নি। তবে বহু দেশে ইসলামী আইনে বহু জায়গায় বদল হয়েছে।

যেমন, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, জোরডান, সুদান আর আফ্রিকার অন্য অনেক দেশ। আমাদের দেশের পাশে পাকিস্তানেও মুসলমানদের সামাজিক আইন অনেক বদল হয়েছে। তাদের মধ্যে তুটো বিষয় বলা যাক। মুসলমান পুরুষের বহুবিবাহ করা কঠিন হয়েছে। আর, স্বামীর ইচ্ছামত তালাক দেওয়া আইনে বেশ রুখে দেওয়া হয়েছে। তার মানে তিনি যখন তখন তালাক তালাক তালাক বললেই তখনই বিয়ে রদ হবে না। স্ত্রীরও তালাক দেবার আইনত অধিকার বাড়ান হয়েছে। পাকিস্তানে আরও অনেক বিষয়ে মুসলমানদের আইনে সুবিধা দেওয়া হয়েছে আর অনেক পুরাণো প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানে স্বামী একটার বেশী বিয়ে করতে চাইলে অনেক জবাবদিহি আর জমাখরচ দিতে হবে। ভারতের মুসলমান ছাড়া অন্য কোন পুরুষ একটার বেশী তুটো বউ একসঙ্গে আর রাখতে পারেন না। কিন্তু এখানে মুসলমান সমাজে সেরকম আইন চালু হয়নি। পাকিস্তানে একটার বেশি বউ ঘরে আনা আইন করে একেবারে পুরো বন্ধ করা হয়নি। সেখানে একটার বেশি বিয়ে করা যায়, তবে সে অনেক বাধা ডিঙিয়ে। অন্য বউ-এর অনুমতি নিয়ে, আর সরকারের হুকুমনামা নিয়ে, দেনমোহর পুরো মিটিয়ে দিয়ে। সাধারণ লোকে অত ঝক্কি সইতে পারবে না। তাই সেখানে সাধারণ মুসলমান একটার বেশি তুটো চারটে বউ এখন আর ঘরে আনতে পারেন না। ভারতে এখনও মুসলমানদের জন্য সেরকম আইন নেই। কিন্তু এখানে শিক্ষিত মুসলমান পুরুষ বা অন্য গরিব লোক একটার বেশি বউ বড় একটা রাখেন না।

তবে একটা কথা নিশ্চয় বলতে হবে। মুসলমান সমাজের

মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি অধিকার ভোগ করে আসছেন। যেমন বিয়ের সময় দেনমোহর। তারপর স্বামী তালাক দিলে কিছুদিন পরে আবার সহজে মুসলমান মেয়ে বিয়ে করতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় কথা মুসলমান মেয়েরা পূর্ব পুরুষের বা সন্তানের সম্পত্তিতে কোন না কোন একটা অংশ পেয়ে আসছেন। আর তা পুরোপুরিই পেয়েছেন, আগেকার হিন্দু মেয়েদের মত জীবন-সত্বে নয়।

আমরা ইসলামী আইনের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে যাব না। এই আইনের নানা শাখা নিয়েও আলোচনা করব না। মুসলমান মেয়েদের অধিকার নিয়ে কয়েকটা মাত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। যেমন সম্পত্তিতে অধিকার, বিবাহ, দেনমোহর আর বিবাহ বিচ্ছেদ। প্রথমে বুঝতে হবে ভারতবর্ষে ইসলামী আইন কিভাবে মানা হয়। এখানকার মুসলমান সমাজের রীতি পরম্পরা যা প্রায় সাতশ' বছর ধরে চলে আসছে, আর আইন নিয়ে আদালতের যেসব রায় বেরিয়েছে, জজদের সেইসব সিদ্ধান্ত মানা হয়। মুসলমান সমাজে আবার দুটো বড় ভাগ আছে—শিয়া আর সুন্নী। ইসলামী আইনেও তাঁদের সমাজের কয়েকজন মহাপুরুষের শরণ নিতে হয়। তাঁরা যা বলেছেন তাই মোটামুটি মানতে হয়। ভারতবর্ষের বেশির ভাগ জায়গায় সুন্নীরা আছেন আর মহাপুরুষদের মতগুলির মধ্যে হানাফী মত মানা হয়। মহান পুরুষ আবু হানিফা এই মত প্রচলন করেন। তারপর তাঁর দুই শিষ্য আবু ইউসুফ ও ইমাম মহম্মদ এই মতের ব্যাখ্যা দেন। তবে আবু ইউসুফের ব্যাখ্যাই বেশি মানা হয়।

বিষয় সম্পত্তিতে অধিকার

মুসলমানদের সম্পত্তিতে তিন রকমের ওয়ারীশ থাকেন ঃ (১) সঠিক অংশীদার (২) বাকী অংশ (৩) দূর আত্মীয়। সম্পত্তি দুভাবে বিলি হয়। এক, উইল করে আর দ্বিতীয় হচ্ছে উইল না করলে ওয়ারীশদের তালিকা মত। তবে ইসলামী আইনে উইল করে সর্বস্ব একজন বা দুজনকে বিলিয়ে দেওয়া যায় না। উইলে সম্পত্তির মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ বেশি বিলি করা যায় না; বাকী দুভাগ ওয়ারীশরা পাবেন। তবে ওয়াকাফ (ইংরাজীতে যাকে বলে ট্রাস্ট বা বাঙলায় দেবোত্তর) আইনের সাহায্য নিয়ে সব সম্পত্তি বিলি করা যায়; কিন্তু সেখানেও মসজিদের জন্য বা ইসলাম ধর্মের কোন ব্যাপারে খরচের অন্তত খুদকুঁড়োও রেখে দিতে হয়।

অংশীদার ঃ সম্পত্তি ওয়ারীশদের কাছে যাবার আগে মৃত কর্তার কতকগুলি দায় দায়িত্ব পালন করতে হয়। পবিত্র কবরে দেহ রাখার খরচা, কর্তার দেনা বা অন্য দায়দায়িত্বের খরচা আগে বাদ দিয়ে নিতে হবে। অন্য দায়ের মধ্যে তাঁর বিধবার দেনমোহর বাকী থাকলে সেটা আগে দিতে হবে। দেনমোহরের কথা পরে আমরা বলব। এখন সঠিক অংশীদারদের কথায় আসা যাক। সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পর দেনা দায় দেবার পর প্রথমে দেখতে হবে জীবিত আত্মীয়দের মধ্যে কারা অংশীদার হতে পারেন। তারপর দেখা হবে ওয়ারীশদের মধ্যে নিয়ম-মাফিক কারা সম্পত্তির আপন আপন অংশ পাবার অধিকারী।

অংশীদারদের একটা চার্ট (তালিকা) এইসঙ্গে আলাদা

পাতায় জুড়ে দেওয়া হল। এতে চারটে কলম বা ভাগ করা আছে। প্রথম কলমে সব অংশীদারদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কলমে অংশীদাররা প্রত্যেকে কত অংশ পেতে পারেন তা লেখা আছে। তৃতীয় কলমে বলা হচ্ছে কোন কোন সর্তে অংশীদার তাঁর ভাগ পেতে পারেন। চতুর্থ কলমে বলা হচ্ছে কোন কোন বিশেষ কারণে অংশের হেরফের হতে পারে।

(চার্টে ইসলামী আইনে সম্পত্তির অংশীদারদের তালিকা দেখুন)। এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে মেয়েদের মধ্যে অনেকে অংশ পেতে পারেন। তাঁরা হলেন—(১) স্ত্রী (২) মা (৩) মেয়ে (৪) ছেলের মেয়ে (৫) নাতির মেয়ে (৬) সহোদর ভগিনী (৭) সতাতো বোন (এক মার গর্ভে কিন্তু ভিন্ন স্বামীর ঔরসজাত) (৮) রক্ত সম্বন্ধে ভগিনী (৯) ঠাকুরমা।

তালিকায় বলা আছে যে ওপর দিকে বা নীচের দিকে যেখানে যেমন সম্বন্ধ সেখানে শুধু একজন নয় তাঁদের পূর্বপুরুষ বা অধস্তন পুরুষদেরও ধরতে হবে। মেয়েদের বেলায় ঐ রকম উপরে ও নীচে সম্বন্ধ বরাবর যতদূর যায় ততদূর কেউ জীবিত থাকলে সম্পত্তির ভাগ কোন না কোন ভাবে পাবার তাঁর সম্ভাবনা আছে। অবশ্য সেই সম্ভাবনা পূরণ হবে অন্য কয়েকটা সর্ত যদি বর্তমান থাকে।

বাকী অংশ ঃ যদি কোন সঠিক অংশীদার না পাওয়া যায়, বা যদি তাঁদের মধ্যে সম্পত্তির অংশ ভাগ বাঁটোয়ারা করে কিছু অংশ বাকী থাকে তাহলে বাকী অংশ নিকট আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ হবে। কোন সঠিক অংশীদার না থাকলে সম্পত্তির সব অংশ বাকী অংশীদারদের মধ্যে ভাগ হবে। আর তাদের

মধ্যে ভাগ করে বাকী অংশ পড়ে থাকলে সেই বাকী অংশ দূর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ হবে।

বাকী অংশ কারা পেতে পারেন তাঁদের একটা তালিকা আলাদা চার্টে দেওয়া হল। এখানে দেখা যাচ্ছে মেয়েদের মধ্যে এঁরা অংশ পেতে পাবেন—(১) মেয়ে (২) ছেলের মেয়ে (৩) সহোদর ভগিনী (৪) রক্ত সম্বন্ধের ভগিনী। এঁদের নিজেদের বংশধারায় বা ছেলে মেয়েব বংশধারায় যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় ততদূর পর্যন্ত সম্বন্ধ খোঁজা হবে। তার মানে একজন না থাকলে তার অন্য জীবিত বংশধরদেব দেখতে হবে।

দূর আত্মীয়ঃ সঠিক অংশীদারদের মধ্যে বা বাকী অংশীদারদের যদি অংশ নেবার কেউ না থাকেন বা বাকি অংশ পড়ে থাকে, তাহলে সম্পত্তি দূর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ হবে। সঠিক অংশীদারদের মধ্যে যদি দেখা যায় শুধু স্বামী স্ত্রী আছেন তাহলে তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য অংশ নেবেন। আর বাকী অংশীদারদের মধ্যে কেউ না থাকেন তাহলে স্বামী স্ত্রী তাঁদের অংশ নেবার পর বাকী অংশ দূর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ হবে।

দূর আত্মীয়দের মধ্যে চার ভাগ করা হয়েছেঃ

(২) সঠিক অংশীদার ও বাকী অংশীদার ছাড়া মৃত মালিকের বংশধরগণ।

(২) সঠিক অংশীদার ও বাকী অংশীদার ছাড়া মৃত মালিকের পূর্বপুরুষগণ।

(৩) সঠিক অংশীদার ও বাকী অংশীদার ছাড়া মৃত মালিকের পিতামাতার অন্য বংশধরেরা।

(৪) পূর্বপুরুষদের মধ্যে যতদূর উঁচুতে যাওয়া যায় তাঁদের বংশধরেরা—অবশ্য বাকী অংশীদারদের ছাড়া।

মালিকের পূর্বপুরুষদের চেয়ে তাঁর বংশধরেরা আগে অধিকার পাবেন। আবার পিতামাতার অন্য বংশধরদের আগে মালিকের পূর্বপুরুষরা অধিকার পাবেন। আবার পূর্বপুরুষদের বংশধরদের আগে পিতামাতার অন্য বংশধরেরা আগে দাবীদার হবেন।

দূর আত্মীয়দের বোঝাতে কিছু উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ

(১) মালিকের বংশধরগণ—(ক) যথা মেয়ের ছেলে মেয়ে আর তাদের বংশধরগণ (খ) ছেলের মেয়ের ছেলে মেয়েরা আর তাদের বংধরগণ।

(২) মালিকের পূর্বপুরুষ—দাদামহাশয় বা দিদিমার দিকে যত পূর্বপুরুষ উঁচুতে যাওয়া যায়। যেমন দাদামহাশয়, দিদিমার বাবা, দাদামহাশয়ের বাবা, ঠাকুরমার বাবা, বা দাদামহাশয়ের মা ইত্যাদি।

(৩) পিতা মাতার অন্য বংশধর—(ক) সহোদর ভাইয়ের মেয়ে আর তাদের বংশধররা ;

(খ) খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইয়ের মেয়ে আর তাঁদের বংশধররা ;

(গ) (আপন মাতা কিন্তু সৎ পিতার দরুণ) ভাইদের ছেলে মেয়ে ও বংশধররা ;

(ঘ) সহোদর ভাই-এর ছেলের মেয়েরা ও তাদের বংশধররা ;

(ঙ) রক্ত সম্বন্ধের ভাই-এর ছেলের মেয়েরা ও তাদের বংশধররা ;

(চ) ভগিনীর (যে কোন সম্বন্ধের) ছেলে মেয়েরা ও তাদের বংশধররা ;

(৪) **পিতামহ ও মাতামহের বংশধরগণ**—(ক) আপন খুড়োর বা জেঠার মেয়েরা ও তাদের বংশধরগণ (খ) রক্ত সম্বন্ধের খুড়োজেঠার মেয়েরা ও তাঁদের বংশধরগণ (গ) সৎপিতা সম্বন্ধে খুড়োরা, তাঁদের ছেলে মেয়ে ও বংশধরগণ, (ঘ) আপন খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইয়ের মেয়েরা ও তাঁদেব বংশধরগণ (ঙ) রক্ত সম্বন্ধের খুড়োজেঠার ছেলের মেয়েরা ও তাঁদের বংশধরগণ (চ) পিসীমা (আপন, সৎপিতা সম্পর্কে বা রক্তের সম্পর্কে) ও তাঁদের ছেলে মেয়েরা এবং তাঁদের বংশধরগণ (ছ) মামা মামী ও তাদের ছেলে মেয়েরা আর তাদের বংশধররা এবং বহু দূর সম্পর্কের বংশধররা।

এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে সব জায়গায় নানা সম্বন্ধের দিক দিয়ে মেয়েরা অনেকে সম্পত্তির অংশ পেতে পারেন।

মুসলমানদের সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারায় দেখা যাচ্ছে সম্পত্তিটা ছোট গণ্ডির মধ্যে সব ভাগ হয়ে যাচ্ছে না। সম্পর্কের গণ্ডিটা এত বড় করা হয়েছে যে, কেউ না কেউ ভাগ পাবার তালিকায় পড়ছেন। অবশ্য তালিকায় থাকলেই যে ভাগ পাবেন তা নয়; সুযোগ এলে পাবেন। কিন্তু হিন্দু বা অন্যদের সম্পত্তি একসঙ্গে সবটা তালিকা মত ভাগ হয়ে যায়। তারপর তাঁরা জগৎ থেকে চলে গেলে আবার নতুন করে ওয়ারীশদের দল আসে। মুসলমানদের বেলায় সম্পত্তির অংশ কে কত পাবেন তার অংশের অংশ-তালিকা দেওয়া আছে। আর সবটাই ছোট গণ্ডিতে বা প্রথম তালিকামত ভাগ হয়ে যাচ্ছে না। বাকী অংশীদার ও দূর আত্মীয়রাও পাচ্ছেন।

তবে মুসলমানদের আইনে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের দাবী

বেশী, অংশও বেশী। ছেলে মেয়ের মধ্যে অংশ ভাগ হলে ছেলে মেয়ের দুগুণ পাবে, আবার বিধবা পত্নী দু আনার বেশী পাবেন না। চার বউ থাকলে সেই দু আনার চার ভাগ হবে।

এখানে অবৈধ সন্তানেরও অংশ আছে। তবে সেটা শুধু মায়ের দিক থেকে। অবৈধ সন্তান মায়ের বৈধ সন্তানের (ভাই সম্পর্ক হলেও) আসল পরিবারের সম্পত্তির কোন অংশ পাবেনা।

বিবাহ

মুসলমান ছেলেমেয়ের বিবাহ এত সহজে আর বিনা ঝন্ঝাটে হয় যে পৃথিবীর অন্য ধর্মের ছেলেমেয়েদের বিবাহে বড় একটা দেখা যায় না। এরকম সহজ সরল বিবাহ অন্য দু' এক জায়গায় হয়ত দেখা যায়; কিন্তু মোটামুটি অন্য সব বড় ধর্মের বিচার করলে এর তুলনা হয় না।

মুসলমান বিবাহ পরস্পারের মধ্যে একটা চুক্তি বলে ধরা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্র কন্যার জন্ম দেওয়া আর তাদের সমাজে সম্মানের সঙ্গে বৈধ স্থান দেওয়া। এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কোন স্থান নেই। কিন্তু ছেলেমেয়ের বিবাহের ব্যবস্থায় মাধুর্য আছে। তাদের সমাজ সলাজ সৌন্দর্য দিয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়। তার অল্প বিবরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে।

কারা বিবাহ করতে পারেন ঃ যে কোন মুসলমান ছেলে বা মেয়ে সেয়ানা হলে বিয়ে করতে পারেন। সেয়ানা হবার বয়স সাধারণত ধরা হয় ১৫ পনের বছর। ভারতবর্ষের আইন মতে ১৮ বছর বয়স না হলে সাবালক হয় না; কিন্তু মুসলমান বিবাহের জন্য এই সাবালক বয়স, মানে আঠার বছরের ছেলে মেয়ে হলে বিয়ের যোগ্য হবে তা ধরা হয় না। এখানে ১৫ বছর হলেই ছেলেমেয়েকে বিয়ের যোগ্য ধরা হয়। তার নীচে হলে নাবালক ধরা হয়। নাবালকদের বিয়ে তাদের অভিভাবক দেন। অভিভাবক হন—পিতা, পিতামহ বা তাঁর উপরের যে কোন পূর্ব পুরুষ, ভাই বা পিতার দিক হতে নিকট পুরুষ

আত্মীয়। পিতৃকূল থেকে কাকেও পাওয়া না গেলে বিয়েতে অভিভাবক হতে পারবেন—মা, মামা, বা মামী এবং মাতৃকূলের অন্য যে কোন ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধে বাধা আছে।

নাবালকের বিয়ে বাবা বা ঠাকুরদা বিয়ে না দিলে, নাবালক ছেলে কি মেয়ে সাবালক হলে বিয়ে ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ অস্বীকার করার আইন তৈরী হয়েছে। নাবালক মেয়ের বিয়ে যদি হয় তাহলে তিনি যদি কয়েকটি বিষয় প্রমাণ দিতে পারেন তাহলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। সেখানে পিতা বা পিতামহ বিয়ে দিলেও মেয়ের দাবী আটকান যাবে না। যে বিষয়গুলি প্রমাণ করতে হবে সেগুলি হল—

(ক) বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে সহবাস হয়নি।

(খ) পনের বছর বয়স হবার আগে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(গ) তিনি ১৮ বছরে পড়ার আগেই বিবাহ অস্বীকার করেছেন।

লাহোরের হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন এই অবস্থায় বিয়ে ভেঙে দেবার জন্য আদালতের ডিক্রীর দরকার নেই। মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্ট অবশ্য ডিক্রী পাওয়ার দরকার বলেছেন। পিতা বা পিতামহদের দল ছাড়া অন্য অভিভাবক নাবালক মেয়ের বিয়ে দিলে সেই মেয়ে ১৮ বছর পড়ার আগেই এইভাবে বিয়ে ভেঙে দিতে পারেন। কিন্তু ছেলের বেলা বয়সের সীমা নেই। তিনি যদি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করেন বা দেনমোহর না দেন তাহলে যে কোন সময়ে বিয়ে ভেঙে দিতে পারেন।

বিবাহে যা নিশ্চয় পালন করতে হবে ঃ বিবাহের জন্য এক পক্ষ প্রস্তাব পাঠাবেন এবং অপর পক্ষ সাক্ষীদের সামনে তা

মেনে নেবেন। এটা করতেই হবে। না হলে বিবাহ সিদ্ধ বা বৈধ হবে না। সাধারণত প্রথমে বিয়ের কথা নিয়ে মেয়ের কাছে বরের নাম ধাম ও বিবাহের দেনমোহর ও সর্ত নিয়ে দুজন সাক্ষী সঙ্গে নিয়ে একজন যান। অবার মেয়ের মত নিয়ে যে ব্যক্তি সাক্ষীদের নিয়ে বরের কাছে যাবেন তাঁর নাম উকীল। [এখানে উকীল মানে আদালতের উকীল নন।] বরের বিবাহের প্রস্তাবের সঙ্গে দেনমোহরের পরিমাণ ও অন্য সর্ত দরকার হলে জানাবে। তবে দেনমোহরের কথা বলতেই হবে। কনে দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ আর দুজন মেয়ে সাক্ষীর সামনে তার সম্মতি জানাবে। এই প্রস্তাব দেওয়া ও সম্মতি জানান একটা দেখাসাক্ষাতেই করতে হবে। দুবার হলে হবে না। ছেলে আর মেয়ে একই জায়গায় থাকবে তা নয়; কিন্তু প্রস্তাবটা ও তার সম্মতি একই দিনে হওয়া দরকার। মেয়ে ইচ্ছে করলে সর্তের মধ্যে তার নিজে বিবাহ-বিচ্ছেদ করার অধিকার ভাবী স্বামীর কাছ হতে আদায় করে নিতে পারে। দুপক্ষের প্রস্তাব ও সাক্ষীদের সামনে সম্মতি বা মতামত পাওয়া গেলেই বিবাহ সম্পন্ন হল। এর জন্য কোন লেখাপড়া কি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দরকার নেই। অবশ্য সব বিয়েতেই যেমন হয়, এখানেও সামাজিক অনুষ্ঠান, খাওয়া দাওয়া, আমোদ আহ্লাদ সবই হয়।

কয়টা বিয়ে হতে পারে? মুসলমান পুরুষ একসঙ্গে চারটে বউ রাখতে পারেন। চারটে বউ থাকতে আবার বিয়ে করলে সে বিয়ে ভাঙবে না, কিন্তু দুর্বল বিয়ে হবে। স্বামী এক বউকে তালাক দিলেই পঞ্চম বউ জাতে পুরো উঠে গেলেন।

কিন্তু মেয়েদের বেলায় একবারে একই স্বামী। স্বামী বেঁচে থাকতে মুসলমান মেয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারেন

না। তালাক হলে অবশ্য কিছু সময় পার হলে আবার তিনি বিয়ে করতে পারেন। স্বামী বেঁচে থাকতে আর তালাক না পেয়ে মুসলমান মেয়ে যদি আবার বিয়ে করেন তাহলে এই দ্বিতীয় বিয়ের ছেলেপুলে অবৈধ হবে। আর সেই মহিলাকে সাত বছর পর্যন্ত জেল খাটতে হতে পারে।

মুসলমান পুরুষের একটার বেশি বউ রাখা আইনত নিষিদ্ধ না করলেও পাকিস্তানে দুটো বউ রাখা সরকার পছন্দ করেন না। আর দুটো বিয়ে করতে গেলে এত ফেসাদ তৈরী করেছেন যে সহজে কোন পুরুষ দুটো বিয়ে করতে এগিয়ে আসেন না। সেখানকার মুসলমান মহিলা সমাজের আন্দোলনের ফলে সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমান মহিলারা অনেকে খুব শিক্ষিত হলেও এরকম কোন জোর আন্দোলন করেননি। তার ফলে এখানে মুসলমান পুরুষের একাধিক বিয়ে আটকান যায়নি। অথচ হিন্দু পুরুষের বেলায় কড়া আইন সরকার করেছেন। এখন কোন হিন্দু বা খৃষ্টান পুরুষ একটা বউ থাকতে আবার বিয়ে করতে পারেন না; করলে লম্বা জেলের সাজা।

উপরে দেখান হয়েছে, মুসলমান মেয়ের একসঙ্গে দুই স্বামী রাখার সাজা খুব কড়া হয়েছে। দুটো স্বামী একসঙ্গে থাকা নিশ্চয় উচিত নয়। কিন্তু পুরুষের বেলায় খোলা দরজা আর মেয়েদের বেলা কড়া সাজা—এটা উদার ইসলাম ধর্মে যুক্তিপূর্ণ হয়নি। সাজাটা লঘু হলে ভাল হত।

কোথায় কোথায় বিয়ে হতে পারে আর কোথায় নয়ঃ

(১) শিয়া-সুন্নী—শিয়া ছেলে আর সুন্নী মেয়ে অথবা সুন্নী ছেলে আর শিয়া মেয়ে বিবাহ করলে বৈধ বিবাহ হবে। কিন্তু

মেয়ের বেলায় তার অধিকার হবে তার বাপের বাড়ীতে যেসব অধিকার সে পেত সেই সব অধিকার।

(২) **অন্য ধর্মের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে**—মুসলমান পুরুষ শুধু মুসলমান মেয়ে নয়, কিতাবিয়াদের মেয়ের সঙ্গেও বিয়ে করতে পারেন। কিতাবিয়া হল ইহুদী বা খৃষ্টান; এই দুই ধর্মের মেয়েকে মুসলমান পুরুষ বৈধ বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু যে সব মেয়েরা প্রতিমা পূজা করেন বা অগ্নি পূজা করেন তাদের সঙ্গে বিয়ে করাটা মুসলমান সমাজ বৈধ বলে মেনে নেন না। এর মানে হিন্দু বা পারসী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। কিন্তু বিয়ে হ'য়ে গেলে আধাআধি মেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ বিয়ে অবৈধ হয় না। অনিয়ম মাফিক হয়।

মুসলমান মেয়েদের বেলায় অন্য নিয়ম ঃ মুসলমান মেয়ে শুধু মুসলমান পুরুষকে বিয়ে করবেন। ইহুদী বা খৃষ্টান পুরুষ হলেও নয়, আর হিন্দু বা পারসী ছেলে হলে ত' নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু মুসলমান সমাজে বিয়ের ব্যাপারে খুব উদারতা দেখান হয়। একেবারে নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বিয়ে যদি না হয়, তাহলে অন্য অপছন্দ বিয়েকে সমাজ আধাআধি মেনে নেয়। এখানে মেয়েদের বেলায় ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু বা পারসী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় না বা অবৈধ বলা হয় না, শুধু বলা হয় এ বিয়ে অ-নিয়মমাফিক বা নিয়মবিরুদ্ধ বিয়ে।

নিষিদ্ধ গণ্ডী ঃ মুসলমান সমাজে অনেকগুলি নিষিদ্ধ গণ্ডী মেনে নেওয়া হয়। এইসব গণ্ডীর মধ্যে বিয়ে হলে বিয়েকে একেবারে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। নিষিদ্ধ গণ্ডীগুলি হল—

(ক) **রক্ত সম্বন্ধ**—মাতা বা পিতামহী আর তাঁর উপরের তলার কোন মহিলা কন্যা বা নাতনী আর তাদের নীচের তলায়

যে কোন মহিলা, নিজ ভগিনী [সহোদর, রক্ত সম্বন্ধ বা মাতার গর্ভে সৎ-পিতার ঔরসে জাত], ভাই-ঝি বা তাদের মেয়ে পিসী বা বাবার পিসী, মামী বা মার মামী।

(খ) **নিকট সম্বন্ধ**—স্ত্রীর মা বা ঠাকুরমা, স্ত্রীর আগের স্বামীর মেয়ে বা নাতনী, বিধবা বিমাতা বা বাবার বিমাতা, ঠাকুরদার বিধবা, বিধবা পুত্রবধূ বা ছেলের বা মেয়ের পুত্রবধূ।

(গ) **দুধ-মা ঃ** গর্ভধারিণী মা ছাড়া অন্য কোন মহিলার বুকের দুধ খেয়ে বড় হলে সেই মহিলাকে চলতি কথায় দুধ-মা বলা হয়। একই দুধ-মার দুধ খেয়ে যদি ছেলে ও মেয়ে মানুষ হয় তাহলে সাধারণত তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারবে না। এই সম্পর্কে কয়েক জায়গায় বিয়ে আটকাবে না। যেমন, বোনের দুধ-মা, দুধ বোনের মা, দুধ-ছেলের বোন, দুধ-ভাইয়ের বোন। এঁদের যে কোন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে।

(ঘ) **বে-আইনী মিলন ঃ** একজন পুরুষের যদি দুই বউ থাকে তাহলে সেই দুই বউয়ের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক থাকা চাই ; মানে, দুই বউএর মধ্যে একজন পুরুষ হলে তাঁরা নিষিদ্ধ গণ্ডির মধ্যে পড়তেন এবং তাঁদের বিয়ে হতে পারত না।

(ঙ) **ইদ্দৎ ঃ** স্বামী গত হলে বা তালাক দিলে স্ত্রীকে ইদ্দৎ পালন করতে হয়। এটা পালনের উদ্দেশ্য হল, স্ত্রী সে সময় সন্তানবতী হয়েছেন কিনা সেটা জানা। তালাক হলে স্ত্রীকে তাঁর তিনটে ঋতু পার করতে হয়। অথবা তিনটে চান্দ্র মাস কাটাতে হয়। স্বামী গত হলে স্ত্রীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দৎ পালন করতে হয়। এই ইদ্দতের সময় বিধবা স্ত্রী বা তালাক পাওয়া বউ বিয়ে করতে পারেন না, ইদ্দৎএর সময় পার হলে তবে বিয়ে করা যায়।

বিয়ের তিন অবস্থা ঃ ঠিক নিয়মকানুন মাফিক বিয়ে হলে 'সহি' বিয়ে হল, বেনিয়মে বিয়ে হলে 'ফাসিদ' বিয়ে হল, আর 'বাতিল' বিয়ে গোড়া থেকেই ভুল আর বাতিল হয়ে গেল। 'ফাসিদ' বিয়ে অনেক কারণে হয়—যেমন (১) 'গাওয়া' বা সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয়েছে, (২) চারিটি বউ থাকতে আবার বিয়ে হয়েছে, (৩) ইদ্দৎ পালনের সময় বিয়ে হয়েছে (৪) ধর্মে ফারাক থাকলে বিয়ে হয়েছে, (৫) বে-আইনী মিলন হয়েছে। 'ফাসিদ' বিয়ে বাতিল হয়না, বিয়ের ছেলেমেয়েও অবৈধ হয় না।

বিয়েকে সমাজ কি ভাবে মেনে নেবে ? যদি সাক্ষাৎ প্রমাণ না থাকে তাহলেও বিয়েকে সমাজ কোন কোন অবস্থায় মেনে নেবে তা বলা হচ্ছে ঃ

দুজনে বহুদিন ধরে স্বামী স্ত্রী হিসাবে সহবাস করে আসছেন। মহিলার সন্তান হলে পুরুষ নিজের বৈধ সন্তান বলে গ্রহণ করেছেন।

মোতা বিবাহ ঃ শিয়াদের মধ্যে দু রকমের বিবাহ আছে —পাকা বিয়ে আর কাঁচা বিয়ে। পাকা বিয়ে মানে পুরো বিয়ে, স্বামী স্ত্রী দুজনে মেনে নিয়েছেন। কাঁচা বিয়ে মানে দিন মাস হিসেব করে সাময়িক বিয়ে। এই বিয়ে একদিনের জন্য বা এক মাসের জন্য বা এক বছরের বা তার বেশি সময়ের জন্য হয়। সেই সময়টা দুজনে স্বামী স্ত্রী হিসাবে বাস করবেন। আর সময় ফুরোলেই বিয়েও শেষ হয়। এ বিয়েতে কিছু দেন মোহর দিতে হয়। এতে তালাক দেবার বালাই নেই।

'সাময়িক বিয়ে' কথাটা শুনতে খারাপ লাগবে। কিন্তু অবস্থা বিশেষের কথা মনে করলে এর পিছনে যুক্তি দেখা যায়। নারী সমাজকে পুরুষদের নিয়ে অনেক সময় বিপাকে

পড়তে হয়। এই রকম বিপাক থেকে পরিত্রাণ পাবার বা সন্তানকে বৈধতা দেওয়ার ব্যবস্থা হিসাবে এর গুরুত্ব আছে। তাই নারী সমাজকে নিন্দা ও গ্লানি থেকে বাঁচাবার জন্য মুসলিম সমাজ মোতা বিবাহের ব্যবস্থা করে মেয়েদের ইজ্জৎ অনেক বাঁচিয়েছেন।

স্ত্রীর ভরণ পোষণ : স্ত্রীর ভরণ পোষণ দিতে স্বামী বাধ্য। তবে স্ত্রীকে পতি-সোহাগিনী হতে হবে, স্বামীরও বাধ্য হতে হবে। স্ত্রী যদি স্বামীর কাছে যেতে রাজী না হন বা অবাধ্য হন, তাহলে স্বামী খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকবেন না। অবশ্য স্বামী দেন-মোহরের জরুরী কিস্তি যদি শিগগির না দেন বা স্বামীর নিষ্ঠুরতায় স্ত্রী পতিগৃহ ত্যাগ করেন, তাহলে অন্য কথা।

স্বামী যদি স্ত্রীকে অবহেলা করেন বা বিনা কারণে স্ত্রীর ভরণ পোষণ না দেন, তাহলে স্ত্রী ভরণ পোষণের জন্য মামলা করতে পারেন। মামলা জিতলে স্ত্রী মাসে মাসে পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত মাসোহারা পেতে পারবেন। স্বামী যদি আর একটা বিয়ে করেন বা রক্ষিতা রাখেন তাহলে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বাস করতে গররাজী হতে পারেন; আর, খোরপোষ দাবী করতে পারেন।

সহবাসের দাবী : স্ত্রী বিনা কারণে স্বামীর সঙ্গে সহবাসে রাজী না হলে স্বামী সহবাসের দাবী করে মামলা করতে পারেন। স্বামীর দাবী ন্যায্য হলে স্ত্রীকে স্বামীর কাছে যেতে হবে। অবশ্য স্বামীর নিষ্ঠুরতার জন্য স্ত্রী রেহাই পেতে পারেন।

দেন-মোহর

মুসলমান মেয়েদের বিয়েতে দেন-মোহর একটা মস্ত বড় অধিকার। বিয়ের আগে বা পরে স্বামীকে দেন-মোহর দেবার অঙ্গীকার করতে হয়। একে শপথ নেওয়াও বলা চলে। তার মানে, শপথ কেউ ভাঙতে পারে না; তেমনি দেন-মোহর দিলে স্বামী কখনই ফাঁকি দিতে পারেন না। তার জন্য স্বামীর পরিবারের সম্পত্তি ধরে স্ত্রী দেন-মোহর আদায় করতে পারেন। এই অধিকার অন্য কোন ধর্মে বড় একটা দেখা যায় না।

দেন-মোহর সাধারণত বিয়ের আগে ঠিক করতে হয়। দেন-মোহর স্ত্রী কত পাবেন তা আগেই ঠিক হ'য়ে যায়। বিয়ের পরে দেন-মোহর বাড়তেও পারে। যদি দেন-মোহরের টাকার অঙ্ক বা জমির পরিমাণ আগে ঠিক না হয়, তাহলে যোগ্য দেন-মোহর স্ত্রী দাবী করতে পারেন। দেন-মোহরের যোগ্য পরিমাণ ঠিক করতে হলে দেখতে হবে, স্ত্রীর বাপের বাড়ীর মেয়েরা কি রকম দেন-মোহর পেয়েছেন। মেয়ের পিসী যত পেয়েছেন, সেই মাপে তাঁর দেন মোহর ঠিক হবে।

দেন-মোহরকে দুটো ভাগ করা হয়। এক ভাগ হচ্ছে বিয়ের পরই দিতে হবে আর বাকীটা স্বামীর মৃত্যুর পর বা স্বামী তালাক দেবার পর। প্রথমটা হচ্ছে জরুরী, দ্বিতীয়টা স্থগিত। দেন-মোহর না দিলে স্ত্রী মামলা করতে পারেন। জরুরী অংশ না পেলে স্ত্রী দাবী করবেন। তখনও না পেলে তিন বছরের মধ্যে মামলা রুজু করবেন। আর স্থগিত দেন-মোহর স্বামী গত হলে বা তালাক দিলে যদি স্ত্রী তাঁর বাকী দেন-মোহর না পান তাহলে দাবী করার দিন থেকে তিন বছরের মধ্যে মামলা শুরু করবেন।

তালাক

ইসলামী আইনে সাধারণত তিন রকম তালাক আছে—(১) স্বামী নিজের ইচ্ছায় তালাক দিতে পারেন, সেখানে আদালতের শরণ নিতে হয় না। (২) স্বামী ও স্ত্রী দুজনের সম্মতিতে; সেখানেও আদালতের সাহায্য দরকার নেই। (৩) স্বামী বা স্ত্রী যে কোনও একজন আদালতের রায় নিয়ে তালাক পেতে পারেন।

তালাকে স্ত্রীর কোন স্বাধীনতা নেই। স্বামী যেমন ইচ্ছে করলেই তিন তালাক বলে তালাক দিতে পারেন, স্ত্রী সেভাবে তালাক পেতে পারেন না। হয় স্বামীর অনুমতি নিতে হয়, না হয়ত আইনের সাহায্যে কয়েকটা বিশেষ কারণে আদালতের কাছে স্ত্রী তালাকের দরখাস্ত পেশ করতে পারেন। বিয়ের চুক্তির মধ্যে স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে একটা সর্ত করিয়ে নেন যে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হোক, তাহলে স্ত্রী সেই অধিকারে তালাক পেতে পারেন। কিন্তু বিয়ের আগে এরকম সর্ত খুব কম হয়।

মুখে মুখে তালাক বা লিখে তালাক ঃ স্বামী মুখে মুখেই তালাক দিতে পারেন। এর কোন বাঁধাধরা বুলি নেই। সাধারণত তালাক বা তালাক তালাক তালাক তিন তালাক বললেই বিয়ে ভেঙে যায়। আবার চিঠি লিখেও তালাক দেওয়া যায়। এর জন্য তালাকনামা কাজীর সামনে তৈরী করতে হয়। মেয়ের বাবা বা অন্য গাওয়াই-এর (সাক্ষীর) সামনেও তালাকনামা নেওয়া যায়। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তালাকনামা লিখতে হয়।

তালাক আসান, তালাক হাসান, তালাক-ই-বাদাই ঃ তালাক আসান দুটো ঋতুর মাঝে সহবাস না করে একবার তালাক বললেই বিয়ের শেকল কেটে যায়। তালাক হাসান স্ত্রীর তিনটে ঋতুর সময়ে সহবাস না করে প্রত্যেক ঋতুতে একবার করে পর পর তিনবার 'তালাক' বললেই বিয়ে ভাঙবে। আর তালাক-ই-বাই স্ত্রীর দুটো ঋতুর মাঝে একবার "আমি তোমাকে তিনবার তালাক দিলাম" বললেই তালাক হয়ে যায়; বা তিনবার "আমি তোমায় তালাক দিলাম", "আমি তোমায় তালাক দিলাম", "আমি তোমায় তালাক দিলাম" বললেই তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

লোক পাঠিয়ে তালাক ঃ স্ত্রীর কাছে কোন লোক পাঠিয়ে স্বামী তালাক দিতে পারেন। স্বামী যেমন বলবেন তাঁর উকীল তেমনি তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে তালাক জানিয়ে আসবেন। তাহলেই তালাক হয়ে গেল।

স্ত্রীর তালাক দেবার অধিকার ঃ বিয়ের আগে বা পরে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে তালাক দেবার অধিকার আদায় করতে পারেন। স্ত্রী তখন যে কোন সময়ে তালাকনামা করে স্বামীর সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিতে পারেন। স্বামীর কাছ থেকে তালাক দেবার এই অধিকার একবার পেলে স্বামী কখনই সে অধিকার ফিরিয়ে নিতে পারবেন না।

জবরদস্তি তালাক ঃ স্বামী কায়দামাফিক তালাক বললে আর রক্ষা নেই। যদি বাপ বা আর কারও জবরদস্তিতে স্বামী বলেন তাহলেও রেহাই নেই। নিজে নেশার ঘোরে তালাক বললে একই ফল হবে। নেশায় বলেছিলাম বললে তালাক ফেরৎ নেওয়া যায় না। তালাক দেওয়ার এমনই শক্তি।

ইলা তালাক ঃ অন্তত চার মাস ধরে যদি সহবাস না হয় তাহলে তালাকের জন্য স্ত্রী আদালতে দরখাস্ত পেশ করতে পারেন। ব্রত করে বা শপথ নিয়ে চার মাস সহবাস বন্ধ রাখলে স্ত্রীর এই অধিকার জন্মায়।

খুলা তালাক আর মুবারাৎ তালাক ঃ স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীকে রাজী করিয়ে দুজনে মিলে মিশে বিয়ের তালাক নিতে পারেন। বিয়ের বাঁধন খুলতে স্ত্রী তালাক পাবার জন্য স্বামীকে কিছু দিতে রাজী হন। স্ত্রী তাঁর দেন-মোহর ছেড়ে দিতে রাজী হতে পারেন বা তাঁর অন্য অধিকার বা স্বামীর সুবিধার জন্য যে কোন ব্যবস্থা নিতে ওয়াদা করতে পারেন। খুলা তালাকে স্ত্রী প্রস্তাব দেন। আর স্বামী যখনই স্ত্রীর প্রস্তাব মেনে নেবেন তখনই তালাক বরাবরের মত পাকা হয়ে যাবে—অর্থাৎ তাঁদের বিয়ে ভেঙে যাবে। স্ত্রী যা ওয়াদা করেছেন তা স্বামীকে দিতেই হবে। একে খুলা তালাক বলে।

মুবারাৎ তালাক একটু ভিন্ন। এখানে স্বামী স্ত্রী দুজনেই তালাক চান। স্বামী বা স্ত্রী দুজনের কোন একজন তালাক দেবার প্রস্তাব করতে পারেন আর স্বামী রাজী হয়ে গেলে তালাক হয়ে যায়। এখানে দেওয়া নেওয়াটা খুব বড় নয়। কারণ স্বামীও বুঝেছেন তালাক হলেই তাঁর নিজের পক্ষে ভাল।

খুলা বা মুবারাৎ যে তালাকই হোক স্ত্রী আর দেন-মোহর সাধারণত দাবী করতে পারবেন না।

ধর্মত্যাগে তালাক ঃ ইসলাম ধর্ম স্বামী বা স্ত্রী ত্যাগ করলে বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। কয়েকটা সর্তে বিয়ে ভাঙে। স্বামী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তখনই পাকাপাকি বিয়ে ভেঙে যাবে।

আইনত তালাকঃ ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন চালু হয়। তার বলে স্ত্রী কয়েকটি কারণ দেখিয়ে আদালতে দরখাস্ত পেশ করে তালাক পেতে পারেন। কারণগুলি হল—

(১) স্বামীর কোন খোঁজখবর চার বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। (২) দুবছর ধরে স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ দিচ্ছেন না। (৩) স্বামীর সাতবছর কারাদণ্ড হয়েছে। (৪) যথেষ্ট কারণ না থাকলেও স্বামী কর্তব্য পালন করছেন না। (৫) স্বামী নপুংসক। (৬) স্বামী উন্মাদ। (৭) স্ত্রীর ১৫ বছর বয়সের আগে তাঁর সম্মতি ছাড়া বিয়ে হয়েছিল। সেই কারণে বিচ্ছেদ চান। (৮) স্বামীর প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা। (৯) ইসলামী আইনে যেখানে যেখানে স্ত্রীকে তালাকের দরখাস্ত পেশ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে সেই কারণে।

এই কারণগুলির যে কোন একটি কারণ দেখিয়ে আদালতে তালাকের জন্য স্ত্রী দরখাস্ত পেশ করতে পারেন।

স্বামীর নিষ্ঠুরতার জন্য তালাকঃ স্বামী খুব নিষ্ঠুর হলে স্ত্রী আদালতে তালাকের জন্য দরখাস্ত পেশ করতে পারেন আর ডিক্রীও পেতে পারেন। নিষ্ঠুরতার বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

(ক) স্বামী প্রায়ই মারধোর করেন; (খ) খারাপ মেয়েদের সঙ্গে মেশেন; (গ) স্ত্রীকে বে-শরম জীবন কাটাবার জন্য জবরদস্তি করেন; (ঘ) স্ত্রীর সম্পত্তি নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেন; (ঙ) স্ত্রীর ধার্মিক আচরণ বা ধর্ম পালনে বাধা দেন; (চ) স্বামীর একাধিক স্ত্রী আছে, কিন্তু তিনি পবিত্র কোরানের আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে উচিত ব্যবহার করেন না।

তালাক পাবার পর দায়-দায়ীত্ব ও অধিকার ঃ

(১) স্ত্রী ইচ্ছে করলে ইদ্দতের পর আবার অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেন।

(২) সহবাস হলে স্ত্রীর পাওনা দেনমোহর তখনই সবটা দিয়ে দিতে হবে। যদি স্ত্রীর সঙ্গে কখনই সহবাস না হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী দেনমোহরের আধা পাবেন।

(৩) তালাক পাকা হলে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তিতে যে অধিকার ছিল তা ছিন্ন হয়ে যাবে।

(৪) তালাক হলে আবার নিজেদের মধ্যে সহজে বিয়ে হয় না। তিন তালাক দিলে তখনই আবার স্ত্রী স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারেন না। স্ত্রী ইদ্দতের পর আবার অন্যজনকে যদি বিয়ে করেন আর সে বিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে এই স্ত্রী আবার পুরাতন স্বামীকে বিয়ে করতে পারবেন। অন্য অন্য ক্ষেত্রে তালাক দেওয়া বউকে স্বামী তারপর আবার বিয়ে করতে পারেন।